কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—২৫

তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম. এ., ডি-লিট্

Presented to

Sri Anandamayi Library
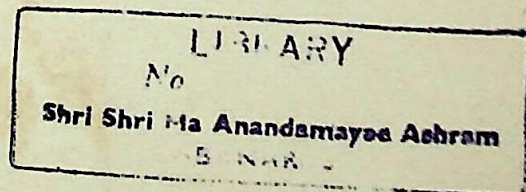
Bhadaini Asram,

Varanasi

Gopinath Kaviraj

22-1-64

Presented to

Sri Anandamayi Library
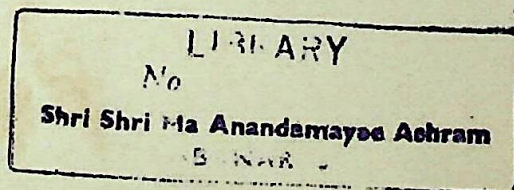
Bhadaini Asram,

Varanasi

Gopinath Kaviraj

22-1-64

তন্ত্র ও আগম-শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন

প্রথম খণ্ড
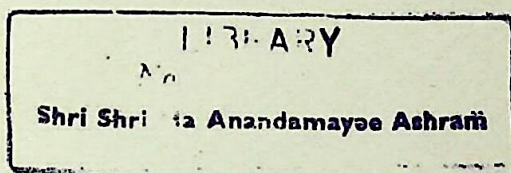
Calcutta Sanskrit College Research Series No. XXV

Published under the auspices of the
Government of West Bengal

STUDIES NO. 12

TANTRA O AGAMA-SASTRER DIGDARSAN
Vol. I.
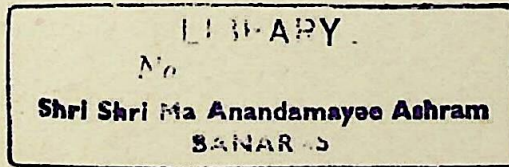
SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1963

Calcutta Sanskrit College Research Series

TANTRA O AGAMA-SASTRER DIGDARSAN

Vol. I.
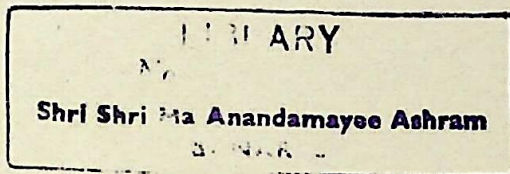
By

MAHAMAHOPADHYAYA
DR GOPINATH KAVIRAJ, M.A., D. LITT.
Honorary Fellow, Sanskrit Seminar, Government
Sanskrit College, Calcutta.

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1963

Calcutta Sanskrit College Research Series No. XXV

তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন

প্রথম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্. এ., ডি. লিট্

সূচীপত্র

বৈদিক সাহিত্যের ন্যায় আগম ও তন্ত্র সাহিত্যও সুপ্রাচীন এবং বৈদিক সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রামাণ্যও বিদ্বৎসমাজে সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে বৈদিক সাহিত্যের সহিত সাধারণ সুধী সমাজের পরিচয় যেমন অল্প, আগম ও তন্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধে উহা তদপেক্ষা স্বল্পতর। এই কারণেই আমরা ইতিপূর্বে বৈদিক সাহিত্যের স্বরূপাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। আমাদের গবেষণা গ্রন্থমালায় শ্রীমৎ অনির্বাণ রচিত 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ সেই প্রয়াসের শুভ সূচনা করিয়াছে। পাঠক সমাজ শুনিয়া সুখী হইবেন উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডও যন্ত্রস্থ।

বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও এতদিন আগম ও তন্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায়কে রূপায়িত করার সৌভাগ্য উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সুখের বিষয় গত বৎসরে আমাদের শিক্ষা-বিভাগের আনুকূল্যে আমরা ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমশাস্ত্রের গবেষণা করিবার জন্য প্রেরণ করি। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যাঁহার পদপ্রান্তে উপনিষন্ন হইয়া এই শাস্ত্রের মর্মকথা শ্রবণ করিবার শুভসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তিনি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সর্বজনমান্য তপোমূর্তি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়। পূজ্যপাদ আচার্যদেব যোগ্য শিষ্যে বিদ্যা বিতরণের অবসরে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে প্রয়োজন হইলে আমাদের গবেষণা বিভাগের জন্য তিনি স্বয়ং গ্রন্থাকারে আগম ও তন্ত্র শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিবেন।

আগম ও তন্ত্র শাস্ত্রের রহস্য গহনগহন। ইহাকে প্রকাশ করিবার যোগ্যতা অল্পজনেরই আছে। দুরন্ত জাহ্নবীবেগ ধারণ করিবার জন্য যেমন যোগিশ্রেষ্ঠ ধূর্জটির জটাজালের অপেক্ষা, অতিগহন আগম-রহস্য প্রকাশের জন্য সেইরূপ তপোগরিষ্ঠ প্রজ্ঞা-মূর্তি পুরুষ-প্রকাণ্ডের অপেক্ষা।

পরমেশ্বর শিবের অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি ব্যতীত কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না—ইহাই আচার্যগণের অভিমত। পরম সৌভাগ্যের বিষয়—সেই শক্তি কবে প্রথম প্রকাশিত হইবে তাহার জন্য আমাদের অধীর প্রতীক্ষা সম্প্রতি ফলবতী হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার আগম ও তন্ত্র শাস্ত্রের দ্বৈতসম্প্রদায়সিদ্ধ তত্ত্বসমূহই প্রধানতঃ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা আশা রাখি যে তিনি অদূর ভবিষ্যতে আগমের অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্বও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
৭।৫।৬৩

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

ভূমিকা

তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শনরূপে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তত্ত্ব, সম্প্রদায় ও সাহিত্যের দিক্ হইতে দুই চারিটি কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে তত্ত্বাংশ শুধু শৈবাগমের দ্বৈত-দৃষ্টিমূলে সংক্ষেপে কিছু আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্বালোচনার অন্তিমভাগে প্রসঙ্গতঃ শাক্তাগম সম্বন্ধে দুই একটি কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বাদ দিলে ইহাতে শাক্তাগমের এবং অদ্বৈত-দৃষ্টির কোনো কথাই আলোচিত হয় নাই। শৈব ও শাক্তাগমের প্রস্থান ভিন্ন হইলেও অনেকাংশে অভিন্ন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর আন্তরিক সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। শাক্তাগমের বহু বিশিষ্ট ধারা আছে; অদ্বৈত শৈবাগমেরও ধারাগত বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সে-সম্বন্ধেও কোনো পরিচয় দিবার অবকাশ এখানে হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বৌদ্ধ ও জৈন আগম আছে এবং বৈষ্ণব আগমও আছে। ঐগুলিও পৃথক্ পৃথক্ প্রস্থান এবং উহাদেরও আলোচনা আবশ্যক, তবে উহার ক্ষেত্র পৃথক্। বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সকল কথা বলার অবসর হয় নাই।

তান্ত্রিক সাহিত্যের আকর-গ্রন্থের সন্ধান দুই দিক্ হইতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ প্রাচীন সাহিত্যে পরম্পরাগতভাবে উপলব্ধ দ্বৈতাদ্বৈতাদি আগমের বিভিন্ন সূচী হইতে; দ্বিতীয়তঃ নবীন যুগের মান্য গ্রন্থসূচী হইতে। যদিও প্রাচীন সূচীতে স্থানে স্থানে মতভেদ লক্ষিত হয় তথাপি ইহার প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে নবীন গ্রন্থসূচীও সর্বথা অপ্রামাণিক প্রতীত হয় না। এই গ্রন্থমধ্যে উভয় সূচীই প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহাই মূল আগম-গ্রন্থের পূর্ণ পরিচয় নহে, কারণ প্রামাণিক সাহিত্যে এমন বহু-সংখ্যক আকর-গ্রন্থের নাম (ও বচনাদি) পাওয়া যায়, যাহা পূর্বোক্ত কোনো সূচীতে সংগৃহীত হয় নাই। দার্শনিক দৃষ্টিতে এবং শাক্ত-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতে এই সকল গ্রন্থের মূল্য কম নহে, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশী। এতদ্ব্যতীত বহু মূল আগমের নাম আমরা পূর্বোক্ত সূচীতে না পাইলেও বিভিন্ন প্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে প্রামাণিক-ভাবেই প্রাপ্ত হই। এই সকল মূল গ্রন্থের কোনো পরিচয় এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে দিবার অবকাশ ঘটে নাই। তাহা ছাড়া প্রকরণগ্রন্থও বহু আছে। উপাসনাভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, ভাবের ধারাগত অভিব্যক্তিভেদে বিভিন্ন যুগে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। তান্ত্রিক সাহিত্যের বিবরণের মধ্যে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান-স্থলে তাহাও সম্ভবপর হয় নাই।

সর্বাপেক্ষা বড় কথা তান্ত্রিক সাধনার রহস্যের আলোচনা। ইহা এই দিগ্‌দর্শনাত্মক পরিচয় গ্রন্থের গণ্ডীর বহির্ভূত না হইলেও আপাততঃ ত্যাগ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যতপ্রকার সাধনা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আণব উপায়েরই কোনো-না-কোনো অংশকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। বাহ্য হউক্, দেহগত হউক্, অথবা যোগপ্রক্রিয়ার অবান্তর ভেদমূলক হউক্, প্রচলিত প্রায় সকল সাধনাই আণব। কিন্তু প্রাচীনকালে শাক্ত উপায়ের দিক্ হইতেও সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোনো কোনো স্থানে আছে। বস্তুতঃ ইহা পূর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। ক্রম-বিজ্ঞানের সকল ধারাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ-সম্বন্ধে প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগে, অতি মূল্যবান্ সাহিত্য ছিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে, অল্প কিছু এখনও গুপ্তভাবে অবশিষ্ট রহিয়াছে। যদি কখনও শাক্ত-সাধনার মহত্ত্বের আলোচনার সময় উপস্থিত হয়, তখন এই

সকল ক্রমমার্গপ্রদর্শক সাহিত্যই উক্ত সাধনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিবে। তারপর শাম্ভব উপায়ানুগত সাধনাও আছে। ইহা বস্তুতঃ সাধনা না হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে অবশ্যই সাধনা-পদবাচ্য। ইহারও প্রতিপাদন প্রাচীন সাহিত্যে আছে।

বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থ শুধু এই বিশাল সাহিত্যের দিকে গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে একদিকে যেমন বৈদিক সাধন-রহস্য ভেদ করার চেষ্টা আবশ্যক, অপরদিকে তেমনি নিগূঢ় তান্ত্রিক সাধন-রহস্যের দ্বারও উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। কোনোটিই উপেক্ষণীয় নহে। আলোচনার বিভিন্ন দিক্ আছে; রুচি, প্রয়োজন ও অধিকারভেদে সকল দিক হইতেই আলোচনার সার্থকতা আছে।

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী গ্রন্থ প্রকাশনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এবং স্নেহভাজন ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি-নির্মাণ হইতে গ্রন্থের অন্তিম প্রুফ-সংশোধন পর্যন্ত সকল কার্য নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কাশীধাম
অক্ষয়-তৃতীয়া
১৩৭০ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

১

আমাদের আলোচ্য বিষয় তান্ত্রিক দর্শন। বহু দিক্ হইতে এই আলোচনা সম্ভবপর হইলেও মনে হয় মূল আগম ও প্রকরণ-গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলে আলোচ্য সিদ্ধান্তের স্পষ্টীকরণ অধিক হইবে। আপাততঃ দ্বৈত শৈবাগমের ভিত্তিতে মূল তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। কামিক, রৌরব, স্বায়ম্ভুব, মৃগেন্দ্র প্রভৃতি আগম এবং অঘোরশিব, সদ্যোজাত, রামকণ্ঠ, নারায়ণকণ্ঠ প্রভৃতি শিবাচার্যের প্রকরণগ্রন্থ মধ্যে এই দ্বৈত সিদ্ধান্তের সবিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতে মূল সত্তা এক দৃষ্টিতে তিনটি বলা যাইতে পারে। এই তিনটিকে আচার্যগণ ত্রিরত্ন বলিয়া অভিহিত করেন। এই তিনটি **শিব, শক্তি** ও **বিন্দু**—এই তিন নামে অভিহিত হয়। ইহার মধ্যে শিব অধিষ্ঠাতা এবং শক্তিমান্। শক্তি এবং বিন্দু উভয়ই শিবের দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং শিবে আশ্রিত। আগমের পরিভাষা অনুসারে যদিও বিন্দুকে শক্তি বলা হয় না, তথাপি দৃষ্টিভেদে ইহাকেও শক্তি বলা যাইতে পারে এবং বলা হইয়াও থাকে। তদনুসারে শক্তি চিৎ-শক্তির নামান্তর এবং বিন্দু পরিগ্রহ-শক্তির নামান্তর। শক্তি বা চিৎ-শক্তি সমবায়িনী। ইহা শিবস্বরূপে সমবেতা থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে যেমন গুণ ও কর্ম দ্রব্যে সমবেত থাকে তদ্রূপ এই দৃষ্টি অনুসারে শক্তিও শিবে সমবেত থাকে। শিব চিৎস্বরূপ, শক্তিও চিৎস্বরূপ—উভয়ের মধ্যে অবিনাভাবসম্বন্ধ। কিন্তু বিন্দু শিবস্বরূপে সমবেত থাকে না; তবে সমবেত না থাকিলেও আশ্রিত থাকে। আশ্রিত থাকে বলিয়াই অনেকে ইহাকেও শক্তি নামে অভিহিত করেন। সাধারণতঃ আগমের দৃষ্টি অনুসারে শক্তি চিদ্রূপেই কল্পিত হইয়া থাকে। তাই কেহ কেহ অচিদ্রূপ বিন্দুতে শক্তি-সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন না।

শিব পরমেশ্বর, কিন্তু শক্তিহীন শিব শবমাত্র। বস্তুতঃ শিব কখনই শক্তিহীন হন না। এই শক্তি-সহযোগেই শিব সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা। শিবের সহিত শক্তির সম্বন্ধ সাক্ষাদ্ভাবে এবং বিন্দুর সম্বন্ধ আশ্রয়-আশ্রিত দৃষ্টিতে সাক্ষাদ্ভাবে হইলেও ক্রিয়ার দিক্ হইতে শক্তির মাধ্যস্থ্যে। এই শক্তিই অবস্থাভেদে ইচ্ছারূপে অথবা জ্ঞানরূপে কিংবা ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার দিক্ হইতে এই একই শক্তি অবস্থাভেদে নিষ্ক্রিয় অথবা সক্রিয় রূপে ব্যপদিষ্ট হয়; বিচারদৃষ্টিতে শক্তি কখনও নিষ্ক্রিয় এবং কখনও সক্রিয়। যখন শক্তি সক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়ারূপা তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় তখন বিন্দুও অক্ষুব্ধ। বিন্দু সৃষ্টির উপাদান-স্বরূপ এবং শক্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারূপা শক্তি নিমিত্ত-স্বরূপ। শক্তি কখনও নিষ্ক্রিয় আবার কখনও ক্রিয়াত্মিকা ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার মূল ইচ্ছা—অর্থাৎ ইচ্ছারূপা অথবা স্বাতন্ত্র্যময়ী শক্তিই শক্তির ক্রিয়াত্মক হওয়ার মূল কারণ এবং শক্তির ক্রিয়াত্মক ভাবই বিন্দুর ক্ষুব্ধ হওয়ার মূল কারণ। অতএব মূলে সৃষ্টির আদি-হেতু ইচ্ছার বহির্মুখতা। ইচ্ছা যখন অন্তর্মুখ তখন ক্রিয়ার উন্মেষ হয় না এবং ক্রিয়ার উন্মেষ না

হইলে বিন্দুক্ষোভও ঘটে না। অতএব পরমেশ্বর বা শিব যখন ইচ্ছাহীন তখন শক্তি ক্রিয়া-রূপে থাকে না বলিয়া না থাকার সমান এবং বিন্দু বিদ্যমান থাকিলেও শক্তির নিষ্ক্রিয়তা-বশতঃ ক্ষুব্ধ হয় না বলিয়া না থাকার সমান। এই অবস্থায় বস্তুতঃ শিব, শক্তি, বিন্দু তিনটিই বিদ্যমান থাকিলেও শক্তি ও বিন্দুর সত্তার ভান থাকে না এবং সেইজন্য শিব প্রকাশাত্মক হইলেও অপ্রকাশবৎ, অদ্বয়বৎ বিদ্যমান থাকেন।

ইচ্ছার উন্মেষে ক্রিয়াশক্তির উদয় হইলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়; তখন সৃষ্টির সূচনা হয়। এই যে বিন্দুর কথা বলা হইল ইহা চিদ্রূপ নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; কারণ চিদ্রূপ শক্তি জগতের উপাদান হইতে পারে না। বিন্দু অচিদ্রূপ, কিন্তু অচিৎ হইলেও ইহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ নহে। এই বিন্দু হইতে যে-সৃষ্টির বিকাশ হয় তাহার নাম শুদ্ধ-সৃষ্টি। ইহাই **শুদ্ধ অধ্বা** নামে পরিচিত। **বিন্দুর নামান্তর মহামায়া। কুণ্ডলিনী, চিদাকাশ** প্রভৃতি ইহাকেই বলা হয়। অশুদ্ধ-সৃষ্টি ইহার পরিণাম নহে, **অশুদ্ধ-সৃষ্টি মায়ার পরিণাম।**[৫] দ্বৈত আগম মতে মায়া এবং মহামায়া একই উপাদানের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুইটি দিক্, কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের ক্ষোভ পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে হয়। অবশ্য এই বিষয়ে নানাপ্রকার দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, ঐ সকলের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রসঙ্গে করিবার প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ-সৃষ্টি না হইলে অশুদ্ধ-সৃষ্টি হইতে পারে না। **শুদ্ধ-সৃষ্টি মহামায়া হইতে উদ্ভূত।** পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে চিৎ-শক্তি সক্রিয় হইয়া যখন মহামায়াকে ক্ষুব্ধ করে, তখন মহামায়া হইতে সৃষ্টির নির্গম হয়। **এই সৃষ্টি শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধবিদ্যা-রূপে পঞ্চধা বিভক্ত। ইহাই শুদ্ধ পঞ্চতত্ত্ব।** অশুদ্ধ-সৃষ্টি মহামায়ার ক্ষোভ হইতে হয় না, মায়ার ক্ষোভ হইতে হয়। মহামায়ার ক্ষোভের মূল শিবের দৃষ্টি, কিন্তু এই দৃষ্টি নির্মল ও নির্বিকল্প বলিয়া মায়াকে স্পর্শ করে না। নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরিবর্তে সবিকল্পক জ্ঞানের উদয় না হইলে মায়া-ক্ষোভের সম্ভাবনা নাই। নিত্যসিদ্ধ আত্মা বা শিব বিকল্পশূন্য। যাহাকে চিৎ-শক্তি বলা হইয়াছে উহাই তাঁহার ইচ্ছা, উহাই তাঁহার জ্ঞান, উহাই তাঁহার ক্রিয়া। উহাতে বিকল্পের সংস্পর্শ মোটেই নাই।

কেন নাই? ইহার কারণ এই যে **বিকল্প শব্দমূলক।** জ্ঞানে শব্দের অনুগম না থাকিলে জ্ঞান সবিকল্পক হইতে পারে না। প্রথমে যে-জ্ঞানের উদয় হয় তাহা, যে কারণেই হউক না কেন, শুদ্ধ ও বিকল্পশূন্য থাকে। উহার পরে শব্দের ক্রিয়ার সংস্পর্শে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া উহা বিকল্পযুক্ত হয়। পরমেশ্বরের জ্ঞানে এইপ্রকার বিকল্পের উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ বিন্দু ক্ষুব্ধ না হইলে পরা-বাক্ প্রভৃতি ক্রম আশ্রয় করিয়া শব্দের ধারা আবির্ভূত হইতে পারে না। এইজন্য প্রাথমিক সৃষ্টি মায়ার ঊর্ধ্বস্থিত নির্মল সৃষ্টিরই নামান্তর। যে-পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব পরম বিন্দুর ক্ষোভের ফলে ঘটিয়া থাকে, তাহা শুদ্ধ-সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু এই সকল তত্ত্বকে অধিষ্ঠান করিয়া অবস্থান করিবেন এমন সব সত্ত্ব কোথায়? কারণ ঐ সময়ে মহামায়া ক্ষুব্ধ হওয়ায় শুদ্ধতত্ত্বের বিকাশ হইলেও ঐ সকল তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বসিবার মত সত্ত্ব বিদ্যমান নাই। ইহাই হইল মহামায়ার ক্ষোভের পর উন্মীলিত প্রথম পর্ব, অর্থাৎ গৃহ-রচনা হইয়াছে কিন্তু গৃহে বাস করিবার লোক এখনও আসে নাই, এই ধরণের অবস্থা। প্রলয় অবস্থাতে যখন মহামায়া এবং মায়া, উভয়ই সুপ্ত থাকে তখন সমস্ত জগৎ 'প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ' ভাব ধারণ করে। মহামায়ার ক্ষোভের পর মায়ার ঊর্ধ্ব-দিকে এবং তদনন্তর মায়ার অভ্যন্তরেও সুপ্তিভঙ্গের সূত্রপাত হয়। অসংখ্য জীব প্রলয়কালে মহামায়াতেও সুপ্ত ছিল, মায়াতেও ছিল এবং ঠিক ঠিক দেখিতে জানিলে দেখা যাইবে যে

প্রকৃতিতেও ছিল। যখন ভগবানের ক্রিয়াশক্তির স্পর্শে সুপ্ত মহামায়া স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে তখন তাহার উদরস্থিত লীন চিদণু সকল জাগিয়া উঠে। সকলেই জাগে তাহা নহে, যাহাদের মল যথোচিত মাত্রায় পরিপক্ক হইয়াছে তাহারাই জাগে। বাকি সকলে মহামায়ার গভীর অতলে মূঢ়ভাবে সুপ্ত থাকে। ক্রমশঃ আগামী কল্পে অথবা তাহারও পরবর্তী কোন কল্পে তাহাদের জাগিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জাগরণের নিয়ামক মলপাক। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু মলপাক-রূপ দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করা যাইতেছে। মায়ার ভিতরে অথবা প্রকৃতির ভিতরে যে সকল চিদণু সুপ্ত রহিয়াছে তাহাদের জাগরণ তখনও হয় নাই, কারণ তখনও মায়ার ক্ষোভ ঘটে নাই, প্রকৃতির ক্ষোভ তো দূরের কথা। এই যে চিদণুর জাগরণের কথা বলা হইল এই সকল চিদণুই জাগ্রত হইলে ভবিষ্যতে আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে শুদ্ধ জগতে সর্বত্র ছড়াইয়া যাইবে। যে-সকল চিদণু মহামায়া-ক্ষোভের ফলে প্রবুদ্ধ হইল তাহাদের সকলেরই মলপাকের মাত্রা একপ্রকার নহে, কিন্তু অল্পই হউক্ বা অধিকই হউক্ যথোচিত পাক সম্পন্ন হইয়া থাকিলে ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তি তাহাদের উপর সঞ্চারিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তি নিরন্তর সূর্যের কিরণের ন্যায় ভগবৎস্বরূপ হইতে নির্গত হইতেছে। কিন্তু অণুসকল যথোচিত মলপাকের অভাববশতঃ মহামায়াতে মগ্ন হইয়া আছে বলিয়া মহামায়ার ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারার দরুণ ঐ শক্তিপাত-রূপ কিরণস্পর্শ প্রাপ্ত হয় না। উদ্বুদ্ধ অণুসকল আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে অনুগ্রহের মাত্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শক্তিপাতের মাত্রা অধিক হইলে সঞ্চারিত শক্তির মধ্যে ক্রিয়াশক্তির অংশ অধিক থাকে। প্রাপ্ত অনুগ্রহ-শক্তিতে অর্থাৎ শুদ্ধবিদ্যাতে জ্ঞান এবং ক্রিয়া উভয়ই থাকে। জ্ঞান ক্রিয়াহীন নহে, ক্রিয়াও জ্ঞানহীন নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞান নিরংশ এবং অক্রম, কিন্তু ক্রিয়াতে অংশ আছে বলিয়া ক্রমও আছে। কিন্তু জ্ঞান পূর্ণ হইলেও ক্রিয়ার মাত্রা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। অতি নিম্নস্তরের সঞ্চারিত শক্তিতেও জ্ঞান পূর্ণই থাকে, কিন্তু অভিব্যক্ত ক্রিয়া-শক্তির মাত্রা কম বলিয়া জ্ঞানের পূর্ণতা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। অতএব শুদ্ধবিদ্যা-স্তরে এবং ঈশ্বর-স্তরে জ্ঞান সম্পর্কে কোনোপ্রকার বাস্তবিক বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও ক্রিয়া সম্বন্ধে পার্থক্য থাকে, যাহার ফলে শুদ্ধ-বিদ্যাতে যে-সকল জাগ্রৎ সত্ত্ব অধিষ্ঠিত হয় তাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশক্তির ন্যূনতাবশতঃ তাহারা করুণ-রূপে স্থিতি লাভ করে। তদ্রূপ ঈশ্বরতত্ত্বে সেই সকল জাগ্রৎ সত্ত্বের সম্বন্ধ ঘটে যাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত অনুগ্রহ-শক্তিতে ক্রিয়াংশের আধিক্য থাকে। এই জন্য এই সকল সত্ত্ব করণ-রূপ না হইয়া কর্তা-রূপ হয়। এই যে করণ অথবা কর্তা, দুইটি ভাবের কথা বলা হইল ইহা পরমেশ্বর কর্তৃক বদ্ধ জীবের উদ্ধরণ-ব্যাপারের করণ ও কর্তা বুঝিতে হইবে। যাহারা কর্তা তাহাদের নাম হয় মন্ত্রেশ্বর এবং যাহারা করণ তাহাদের নাম মন্ত্র অথবা বিদ্যা। মন্ত্রেশ্বর গুরুপদবাচ্য; জীবোদ্ধার ব্যাপারে ইঁহারা গুরুর কার্য করিয়া থাকেন। যে করণের দ্বারা মন্ত্রেশ্বররূপী গুরু জীবোদ্ধার কার্য সম্পন্ন করেন তাহাকেই মন্ত্র বলে। বলা বাহুল্য, মন্ত্র ও মন্ত্রেশ্বর উভয়ই অশুদ্ধ-মায়োত্তীর্ণ চিদণু হইতেই আবির্ভূত হ'ন। মন্ত্রেশ্বর সংখ্যাতে আট এবং মন্ত্র সংখ্যাতে সাত কোটি। এই সাত কোটির মধ্যে অর্ধাংশ শুদ্ধজগতে এবং অর্ধাংশ মায়াজগতে ব্যবস্থিত হয়। আটজন মন্ত্রেশ্বরের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, তাঁহাকে অনন্ত নামে অভিহিত করা হয় এবং যিনি সর্বান্তিম বা অষ্টম তাঁহার নাম শিখণ্ডী। বলা বাহুল্য এগুলি পদেরই নাম, ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। প্রত্যেকটি ঊর্ধ্বস্থ পদ জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক শক্তিতে অধঃস্থিত পদ হইতে উৎকৃষ্ট; সুতরাং এই অষ্ট মন্ত্রেশ্বরের মধ্যে অনন্তই প্রধান। ইঁহাকেই সাধারণতঃ ঈশ্বর বলা হয়। অনন্ত মায়ার অধিষ্ঠাতা। অনন্তের শক্তি দ্বারা মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া কলা হইতে আরম্ভ করিয়া

পৃথ্বী পর্যন্ত ৩১টি তত্ত্ব প্রসব করে, যাহা হইতে সম্পূর্ণ মায়িক জগতের আবির্ভাব হয়। অতএব **অনন্ত ঈশ্বর** অর্থাৎ **মায়াধিষ্ঠাতা** এবং **শিব পরমেশ্বর** অর্থাৎ **বিন্দুর অধিষ্ঠাতা**। এইরূপ নিয়ম আছে যে কোনো সময়ে মন্ত্রেশ্বরের পদ খালি হইলে মন্ত্র হইতে মলপাকের মাত্রা অনুসারে উচ্চ অধিকারীকে মন্ত্রেশ্বর পদে নিয়োগ করা হয় অর্থাৎ কোনো মন্ত্রেশ্বরের পদ খালি হইলে নিম্নবর্তী মন্ত্রেশ্বরের দ্বারা ঐ পদের পূরণ হয় এবং অন্তিম মন্ত্রেশ্বরের পদ এইভাবে রিক্ত হইলে মন্ত্র হইতে যথোচিত যোগ্যতাবিশিষ্ট মন্ত্রকে মন্ত্রেশ্বরের পদ দেওয়া হয়। এইরূপ নিয়ম শুদ্ধ অধ্বাতে সর্বত্র জানিতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে শিবের শক্তি, যাহা নির্বিকল্পক জ্ঞানস্বরূপ, তাহার দ্বারা মায়ার ক্ষোভ হয় না। মায়া অশুদ্ধ বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞানাত্মক শক্তি ক্ষোভক-রূপে আবশ্যক হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান সবিকল্পক, নির্বিকল্পক নহে। শুধু ঈশ্বরের নহে, শুদ্ধ অধ্বার সকল অধিকারীরই জ্ঞান সবিকল্পক, নির্বিকল্পক নহে। নির্বিকল্পক জ্ঞান সেখানে নাই অথবা থাকিতে পারে না এমন নহে, কারণ বিকল্পের পৃষ্ঠভূমিতে নির্বিকল্পক জ্ঞান থাকেই। তবে উহা ক্ষোভের নিমিত্ত হয় না। শুদ্ধ নির্বিকল্পক জ্ঞান বিন্দু-ক্ষোভজন্য শব্দদ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া সবিকল্পক-রূপে পরিণত হয়। অদ্বৈত দৃষ্টিতে বিকল্পও শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুই-প্রকার; কিন্তু সে আলোচনা সময়ান্তরে করিব।

শুদ্ধ-বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব প্রভৃতি প্রতি তত্ত্বেই **ভুবন** আছে এবং এই সকল ভুবনকে উপাদান-রূপে গ্রহণ করিয়া যে-সকল কার্য উদ্ভূত হয়, তাহাদের তিনপ্রকার শ্রেণী বা বিভাগ আছে। একটি **দেহ**, দ্বিতীয়টি **ইন্দ্রিয়** এবং তৃতীয়টি **ভোগ্য বিষয়**। শুদ্ধ প্রমাতা ঐ সকল দেহ আশ্রয় করিয়া **প্রমাতা**-রূপে কার্য করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের করণ অর্থাৎ **প্রমাণ** এবং বিষয়সকল তাহাদের ভোগ্য অর্থাৎ **প্রমেয়**। এই সকল দেহ **ভুবনজ-দেহ** নামে প্রসিদ্ধ। এইপ্রকার বিভাগ মায়িক তত্ত্বের সম্বন্ধেও আছে জানিতে হইবে। ভুবনজ-দেহের পশ্চাতে আছে **তত্ত্ব-দেহ**। তত্ত্ব-দেহ ভুবনজ-দেহকে ধারণ করে এবং উহার ত্যাগের পর ঐ ভুবনে বা লোকান্তরে অন্য ভুবনজ-দেহ ধারণ করে। ভুবনজ-দেহ ভিন্ন ভোগাদির নিষ্পত্তি হইতে পারে না। যদিও প্রসিদ্ধ ভোগ মায়িক জগতের ভোগায়তন-রূপ স্থূল দেহেই ঘটিয়া থাকে, কারণ পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম মায়িক জগতেই সম্ভবপর, তথাপি ইহাও সত্য যে বিশুদ্ধ মায়ারাজ্যেও তদনুরূপ কর্ম আছে এবং তদনুরূপ ভোগও আছে। অধিকার ও লয়ের ন্যায় বিশুদ্ধ ভোগও শুদ্ধ মায়াজগতের ব্যাপার।

শুদ্ধ মায়াজগতের মূল উপাদান বিন্দু এবং অশুদ্ধ মায়া জগতের মূল উপাদান মায়া। বিন্দুতে ভগবৎ-ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ক্রিয়াশক্তির মাত্রার তারতম্য অনুসারে এই **ক্ষোভাবস্থা তিনপ্রকার**। তদনুসারে একটি অবস্থাকে বলা হয় **ক্ষুব্ধ**। অন্য একটি অবস্থাতে ক্ষোভ অপেক্ষাকৃত মৃদু বলিয়া উহাকে বলা হয় **ক্ষোভোন্মুখ** এবং আর একটি অবস্থায় ক্ষোভ সক্রিয়ভাবে একপ্রকার নাই বলা যায়, তথাপি উহাতে ক্ষোভের স্পর্শ আছে। এই জন্য ঐ অবস্থাটি **অক্ষুব্ধ** নামে পরিচিত হইলেও ক্ষোভস্পর্শবিহীন নহে। আত্মা প্রথম অবস্থায় বিন্দুর অন্তর্গত। এই বিন্দু ক্ষুব্ধ এবং আত্মার অবস্থা **অধিকার** নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এই আত্মা **অধিকারী** আত্মা। এই আত্মা ঈশ্বর পদে আরূঢ়। ইহাকে সাধারণতঃ **অধিকার অবসর** বলে। দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু ক্ষোভোন্মুখ বলিয়া আত্মাতে অধিকার-সম্পত্তি থাকে না এবং ঐশ্বর্যের ক্রিয়াও থাকে না। এই সকল আত্মা অধিকারী

নহে, কিন্তু ভোগী। এই ভোগ আত্মানন্দ-সম্ভোগ ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহারা ঐশ্বর্য-সম্পন্ন অধিকারী আত্মা হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ইহারা সর্বদা আনন্দ-সম্ভোগে মগ্ন থাকে। বিন্দুর ক্ষোভোন্মুখ অবস্থা হইতেই আনন্দের উদ্ভব হয়। ইহারও ঊর্ধ্বে যে সকল আত্মা আছেন, তাঁহারা ঐশ্বরিক বা আধিকারিক আত্মা হইতে এবং স্বরূপানন্দ সম্ভোগশীল আত্মা হইতেও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই অবস্থাকে লয় বলে। অনেকে ইহাকে নির্বাণ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা নির্বাণ নহে। শুধু নির্বাণ নহে তাহা নয়, ইহা আত্মার স্বরূপ-স্থিতিও নহে। যদিও এই অবস্থায় শিবত্ব একপ্রকার অনাবৃতভাবেই প্রকাশিত হয় তথাপি এখানেও কিঞ্চিৎ আবরণ আছে। এই আবরণটি আর কিছু নয়, বিন্দুর সম্বন্ধ বা স্পর্শ। কারণ এই অবস্থায় বিন্দু, ক্ষুব্ধ বা ক্ষোভোন্মুখ না হইলেও, থাকে। বিন্দু অচিৎ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যতই শুদ্ধ হউক না কেন আত্মা যতক্ষণ ইহার স্পর্শ হইতে মুক্ত না হয় ততক্ষণ সে অবস্থাকে যথার্থ শিবত্ব বলা যায় না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে : এই লয়স্থিতি বা তথাকথিত নির্বাণ এবং বিজ্ঞানকৈবল্য এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এই দুইটি স্থিতি আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই মনে হয়। লয়স্থিতি বস্তুতঃ বিন্দুস্থিতি। ইহাই আত্মার শিবতত্ত্ব-রূপে অবস্থান। ইহা শিবতত্ত্ব হইলেও তত্ত্বাতীত শিব নহে। সুতরাং এই অবস্থাকেও আত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি বলা যায় না। এই অবস্থাতে বিন্দু ক্ষুব্ধ নহে, এমন কি ক্ষোভান্মুখও নহে; কিন্তু তথাপি বিন্দু-সম্বন্ধ আছে। ইহা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্বাতীত নিত্যমুক্ত শিবস্বরূপ অধিগত হয়। চিৎ-শক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে এই অবস্থা লাভ করা যায়। বিজ্ঞান-কৈবল্যে অচিৎ-সম্বন্ধ কাটিয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু চিৎ-শক্তির প্রাপ্তিতে ক্রমশঃ শিবত্বের আভিমুখ্য ঘটে। বিজ্ঞান-কৈবল্যের ক্রমোৎকর্ষে অচিৎ-সত্তার ক্রমিক বহিষ্কার ঘটিয়া থাকে, যাহার ফলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্য অবস্থায় অচিৎ-সত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ অচিৎ-সত্তাও মোটেই থাকে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে লয় অবস্থার পরে যে শিবভাবের উদয় হয় সেখানেও অচিৎ-সত্তার সম্বন্ধ থাকে না, এমন কি বিশুদ্ধ অচিৎ-সত্তারও নহে। কৈবল্যের পথে প্রথমতঃ অশুদ্ধ অচিৎ-সত্তা হইতে পৃথগ্‌ভাব সংঘটিত হইলেও বিশুদ্ধ অচিৎ-সত্তার সম্বন্ধ থাকে, অবশ্য সর্বান্তে তাহাও থাকে না। শুদ্ধ অধ্বাতে বিশুদ্ধ অচিৎ-সত্তার সম্বন্ধ থাকিলেও চিৎ-শক্তির কার্যকারিতাবশতঃ উহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। চিৎ-শক্তির উন্মেষ বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া হয় বলিয়া যদিও প্রথম প্রথম বিন্দুর সংশ্রব থাকে তথাপি সর্বশেষে বিশুদ্ধ চিৎ-শক্তিই থাকিয়া যায়; বিন্দু নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। তখন চিৎ-শক্তি উহাকে অতিক্রমণ করে। বিশুদ্ধ চিৎ-শক্তির প্রকাশ বিন্দু হইতে মুক্ত হওয়ার পর পূর্ণভাবে ঘটে। তখন ঐ শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ইহাই নিত্যমুক্ত শিবাবস্থার উদ্ভব। শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া বিন্দুকে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ করে এবং ক্ষোভের অবসানে শক্তি আবার নিষ্ক্রিয় হইয়া শান্ত-স্বরূপে অবস্থান করে। ইহাই আত্মার শিবত্ব। বিশুদ্ধতম কৈবল্যে বিন্দুর স্পর্শ না থাকিলেও এইপ্রকার শিবত্বের অভিব্যক্তির সম্ভাবনা নাই।

২

বিন্দু সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্বে পশু-আত্মা সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। এই সকল আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, বিভু, চেতন ও অন্যান্য শিবধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও সংসারাবস্থায় ঐ সকল ধর্মের বিকাশ অনুভব করিতে পারে না। সর্ব জ্ঞানক্রিয়া-রূপা শক্তি যেমন শিবের আছে তেমনি জীব বা পশুমাত্রেরই আছে। ইহাই চৈতন্য-শক্তি। শিবস্বরূপে এই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বরূপা শক্তি সর্বদা অনাবৃত। পশুতেও এই শক্তি সমরূপেই আছে বটে কিন্তু পশুর সর্ব জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি অনাদি কাল হইতে পাশসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ। মল, কর্ম ও মায়া এই তিনপ্রকার পাশের মধ্যে কোনো আত্মা এক পাশে আবদ্ধ, কেহ দুই পাশে এবং কেহ কেহ তিন পাশেই আবদ্ধ আছে। পাশের বিশেষ বর্ণনা পরে করা যাইতেছে।

যে সকল আত্মায় মলাদি তিনপ্রকার পাশেরই বন্ধন রহিয়াছে, তাহাদিগকে স-কল আত্মা বলে। যাহাদিগের মায়িক কলাদি প্রলয়াদি অবস্থায় উপসংহৃত হইয়াছে অথচ মল ও কর্ম অক্ষীণ রহিয়াছে, তাহাদিগের শাস্ত্রীয় নাম প্রলয়াকল। বিজ্ঞান প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে কর্মক্ষয় সিদ্ধ হইলে শুধু মল-নামক একটিমাত্র পাশ বর্তমান থাকে। এই অবস্থায় আত্মাকে বিজ্ঞানাকল বলা হয়।

সুতরাং আমরা দেখিলাম পশু বা **জীব তিনপ্রকার :**

(১) **স-কল**—ইঁহাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান। দেহ ভোগায়তন ও কর্মজন্য। প্রারব্ধ কর্মের ভোগান্তে দেহ নাশ হয়।

(২) **প্রলয়াকল**—ইঁহারা প্রলয়কালে দেহসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ইঁহাদের দেহও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই। দেহের মূল উপাদান ও ইন্দ্রিয়ের উপাদান মূল প্রকৃতিতে লীন হইয়া আছে। এটি অজ্ঞান অবস্থা, সুষুপ্তিবৎ। সকল জীবই প্রলয়কালে প্রলয়ের অবস্থিতি পর্যন্ত এইপ্রকার বিদেহ ও বিকরণ অবস্থাতে অজ্ঞানাত্মক মূল প্রকৃতিতে লীন থাকে। ইহারাই প্রলয়াকল পশু।

(৩) **বিজ্ঞানাকল**--ইঁহারাও বিদেহ ও বিকরণ। কিন্তু এই অবস্থা-প্রাপ্তি কালের প্রভাবে অর্থাৎ শুধু প্রলয়ের জন্য ঘটে না। এই অবস্থা-প্রাপ্তির মূল, বিবেকজ্ঞান। বিবেক-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ চিদাত্মা যখন নিজেকে অচিৎ হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ বলিয়া বোঝে তখন চিরদিনের জন্য অচিৎ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিন্ময় নিজ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। এই সকল জীবকে বিজ্ঞানাকল বলে। ইঁহাদের দেহ ইন্দ্রিয়াদি নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, কারণ বিবেকজ্ঞানের দ্বারা কর্মসম্বন্ধ ও মায়াসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানাকল জীব তিনপ্রকার: (১) প্রকৃতি হইতে চিৎ বিবিক্ত হইলে যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নিম্নতম বিজ্ঞানকৈবল্য। (২) মায়া হইতে বিবেক সংঘটিত হইলে মধ্যম বা দ্বিতীয় প্রকার বিজ্ঞানকৈবল্যের উদয় হয়। (৩) এইরূপ মহামায়া হইতে বিবেক ঘটিলে উচ্চস্তরের বিজ্ঞানকৈবল্য লাভ হয়। যে কোনোপ্রকার বিজ্ঞানাকল অবস্থাই হউক্ না কেন,

তাহাতে কর্মমায়াদি না থাকিলেও আণব-মল থাকে। এই আণব-মল অপগত না হইলে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই পশুত্ব। পশুত্বের বা আণব-মলের নিবৃত্তির একমাত্র উপায় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চার এবং তন্মূলক দীক্ষারূপা ক্রিয়া। দীক্ষার ফলে অর্থাৎ শুদ্ধবিদ্যার উদয়ে শিবত্বলাভের মার্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রম অবলম্বনপূর্বক ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে হয়। শুদ্ধ বিদ্যার উদয়ে বিশুদ্ধ অহন্তার অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়। মায়ার আবরণে আবৃত জীব যে অহং-এর সহিত পরিচিত, তাহার স্বরূপ অনাত্মাতে আত্মবোধমাত্র, অপর কিছু নহে। বস্তুতঃ ইহা অজ্ঞানেরই বিলাস। অদ্বৈতাগমে অজ্ঞানের আরও একটি রূপ আছে, তাহা আত্মাতে অনাত্মবোধ, কিন্তু উহা অনেক উপরের অবস্থা। এই উভয়প্রকার অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে আত্মা নিজেকে শিবরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। উহাই আত্মার বিশুদ্ধতম রূপ। সেখানে আত্মাতে অনাত্মবোধ-রূপ অজ্ঞানও নাই এবং অনাত্মাতে আত্মবোধ-রূপ অজ্ঞানও নাই।

অদ্বৈতবাদী বৌদ্ধগণও, বিশেষতঃ যোগাচার বিজ্ঞানবাদী আচার্যগণ, এইপ্রকার দ্বিবিধ অজ্ঞান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। একটি ক্লিষ্ট অজ্ঞান, অপরটি অক্লিষ্ট অজ্ঞান। পুদ্গল-নৈরাত্ম্যের উপলব্ধি হইলে ক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তাহার ফল নির্বাণ, বুদ্ধত্ব নহে। ক্লিষ্ট অজ্ঞান না থাকিলেও অক্লিষ্ট অজ্ঞান তখনও থাকিয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধত্ব আসে না। অক্লিষ্ট অজ্ঞান না থাকিলে মহাকরুণার অনুশীলন হয় না। পক্ষান্তরে, অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত মহাবোধির উদয় হয় না এবং বুদ্ধত্বেরও লাভ হয় না। সমস্ত বোধিসত্ত্বভূমিগুলি অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তির ক্রমনির্দেশক। ভূমিসকল পর পর জয় করিতে পারিলে অন্তে অক্লিষ্ট অজ্ঞান পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বুদ্ধত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়। অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তির মূল ধর্মনৈরাত্ম্য-জ্ঞান। যাহা হউক্, এই অক্লিষ্ট অজ্ঞান ও ক্লিষ্ট অজ্ঞানের কল্পনা মূলতঃ আগমেরই কল্পনা। বৌদ্ধগণ উহা নৈরাত্ম্যবাদের সহিত যোজনা করিয়া লইয়াছেন এবং শৈব শাক্তগণ উহা পরমশিব বা পরাশক্তির সামরস্যের দিক্ হইতে যোজনা করিয়া লইয়াছেন।

এই যে তিন প্রকার পশু বা জীবের কথা বলা হইল ইঁহাদের সকলেরই আণবমল বা আত্মসংকোচ আছে। অন্য দুই মল কাহারও কাহারও আছে, কাহারও কাহারও নাই। এই আণবমল দূর করিবার জন্যই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চার আবশ্যক হয়। ভগবদনুগ্রহ সাক্ষাদ্‌ভাবেও হয় এবং পরম্পরাতেও হয়। সাক্ষাদ্‌ভাবেই হউক্ অথবা কোনো মাধ্যমের আশ্রয়েই হউক্, ধারকের যোগ্যতা উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক। এই যোগ্যতা দ্বৈতদৃষ্টিতে ধারকের সাধনাবল নহে, কারণ ব্যক্তিগত সাধনার ফল পৃথক্ নির্দিষ্ট আছে। সাধনার ফলে পূর্ণত্বলাভ ব্যতীত অথবা পূর্ণত্বের পথে গতিলাভ ব্যতীত বাকী সকল সম্পদ্‌ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্ন স্বর্গপ্রাপ্তি, ঊর্ধ্ব স্বর্গপ্রাপ্তি, অভাবরূপী অপবর্গ বা জাগতিক দুঃখনিবৃত্তি এবং ভাবাত্মক অপবর্গ বা চিৎস্বরূপ কৈবল্যে স্থিতি—সবই সম্ভব, কিন্তু পূর্ণত্বলাভ সম্ভব নয়। তাহার জন্য পূর্ণের অনুগ্রহ আবশ্যক। এই অনুগ্রহ-সঞ্চার বা শক্তিপাত পূর্ণত্বলাভের অবর্জনীয় প্রাক্‌সর্ত বা pre-condition.

প্রশ্ন হইতে পারে : এই অনুগ্রহপ্রাপ্তির যোগ্যতার স্বরূপ কি? অবশ্য পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে স্বাতন্ত্র্যই অনুগ্রহের মূল কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে মূলে স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও দ্বৈতভাবে বিভিন্নপ্রকার কল্পনার

অবকাশ থাকে। তন্মধ্যে আগমশাস্ত্রে, বিশেষতঃ দ্বৈতাগমে, কর্মসাম্য, সংন্যাস প্রভৃতির অপেক্ষা **মলপাকেরই** আপেক্ষিক প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মলের পাকে তারতম্য থাকিলে শক্তিপাতে তারতম্য ঘটে। অবশ্য স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টিতে এই শক্তিপাতের তারতম্যে মলপাকের অপেক্ষা নাই, ইহা সত্য। এখানে মলপাকের দিক্ দিয়াই বিচার করা যাইতেছে। পশু-মাত্রেই মল আছে এবং সকলের মলই **কালপ্রভাবে** এবং অন্যান্য কারণে **নিরন্তর অল্পাধিক পক্ক হইতেছে।** কিন্তু পাকের যে মাত্রায় শক্তিপাত ঘটে সেই মাত্রা পর্যন্ত পাক না হইলে সেই আত্মা ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির অধিকারী হয় না। অবশ্য তখন হয় না, কিন্তু কালান্তরে পাক সম্পন্ন হইলে অধিকারী হইয়া থাকে। এই কল্পেও হইতে পারে, কল্পান্তরেও হইতে পারে। প্রলয়ের পর সমগ্র বিশ্ব লীন হইয়া যায়। তখন কার্যমাত্রই পরম কারণে অব্যক্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য কোনো কোনোটি **বীজসহিত অব্যক্ত** হয় এবং কোনো কোনো স্থলে **বীজ দগ্ধ হইয়া অব্যক্ত** অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। যে সব চিদণু অভিনব সৃষ্টিতে পুনরাবর্তনের বীজসহকারে প্রলয়নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে তাহাদিগকেই পূর্বে 'প্রলয়াকল' বলা হইয়াছে। কিন্তু যে সকল চিদণু জ্ঞানাদির দ্বারা বীজ দগ্ধ করিয়া প্রলয়ে স্থিত হয় তাহারা 'বিজ্ঞানাকল' নামে প্রসিদ্ধ। **প্রলয়াকল** জীব বিদেহ হইলেও অভিনব সৃষ্টিতে **পুনরায় দেহ গ্রহণ** করে, কারণ তাহাদের কর্মবীজ দগ্ধ হয় নাই। **বিজ্ঞানাকল** জীব অভিনব সৃষ্টিতে **পুনরাবর্তন করে না**; তাহাদের অবস্থাকে বিজ্ঞানকৈবল্য বলে। তাহারা সংসারে আবর্তন করে না সত্য, কিন্তু **তথাপি তাহারা পূর্ণ নহে।** আগম তাহাদিগকে পূর্ণ বলেন না, কারণ তাহারা পূর্ণত্ব বা শিবত্ব লাভ করে নাই। শুধু লাভ করে নাই তাহা নহে, আণবমল আছে বলিয়া তাহারা পূর্ণত্বের পথেও পদার্পণ করে নাই।

এই সকল জীবের মধ্যে, **আগামী** ও **অনাগামী** উভয়প্রকার জীবের মধ্যে, সকলের স্থিতি একপ্রকার নহে। কারণ আণবমলের পরিপক্কতা সর্বত্র সমান নহে। যাহাদের মলপাক সমুচিত ঘটিয়াছে দেখা যায় তাহাদের উপর অবশ্যম্ভাবিরূপে শক্তিপাত ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রলয়াকলের মধ্যেও সম্ভব এবং বিজ্ঞানাকলের মধ্যেও সম্ভব। ভগবান্ অভিনব সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকারী, শুধু সৃষ্টিকারী নহে, সৃষ্টির সংরক্ষণ ও সংহারকারী অধিকারিবর্গের আয়োজন করেন। ইহারই নাম **শুদ্ধ অধ্বার** সৃষ্টি। মায়িক সৃষ্টি এখনও আরম্ভ হয় নাই। মায়িক সৃষ্টি স্বয়ং পরমেশ্বর করেন না, শুদ্ধ অধ্বার সৃষ্টি পরমেশ্বর স্বয়ংই করেন। এখানে দ্বৈত-দৃষ্টি লইয়া কয়েকটি কথা বলিতেছি, যাহাতে বুঝিবার সৌকর্য হইবে। আগমে **সৃষ্টিকে শুদ্ধ** ও **অশুদ্ধ** এই দুইভাগে অথবা শুদ্ধ, মিশ্র ও অশুদ্ধ এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। অশুদ্ধ সৃষ্টি অথবা **মিশ্র সৃষ্টি মায়া হইতে** ঘটিয়া থাকে। মায়া ক্ষুব্ধ হইলে অশুদ্ধ সৃষ্টির উদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমেশ্বর **স্বয়ং মায়াকে ক্ষুব্ধ করেন না।** মায়া বলিতে এখানে অশুদ্ধ মায়াকে বুঝিতে হইবে। দ্বৈতমতে **পরমেশ্বর স্বয়ং শুদ্ধ** মায়া বা **মহামায়াকে ক্ষুব্ধ করেন।** ইহারই নামান্তর **বিন্দু** বা **কুণ্ডলিনী** বা **চিদাকাশ।** মহামায়া ক্ষুব্ধ না হইলে শুদ্ধ জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাই শুদ্ধ জগতের নামান্তর **বৈন্দব জগৎ।** ইহা জ্যোতির্ময়, ইহাতে অশুদ্ধ মায়ার প্রবেশ নাই। অশুদ্ধ মায়া ক্ষুব্ধ না হইলে নিম্নবর্তী **অশুদ্ধ** জগৎ, যাহা **কলা হইতে পৃথ্বীতত্ত্ব পর্যন্ত** বিস্তৃত, সৃষ্ট হইতে পারে না। **অশুদ্ধ** মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া কার্যে পরিণত করার জন্য ক্ষোভক আবশ্যক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে-সকল চিদণু বিজ্ঞানাকল বা প্রলয়াকল অবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা পক্কমল তাহাদের উপর পরমেশ্বরের অনুগ্রহশক্তির সঞ্চার সাক্ষাদ্‌ভাবেই ঘটিয়া থাকে।

৩

পূর্ববর্ণিত বিজ্ঞানাকল বা বিজ্ঞানকেবলী আত্ম মলের পরিপাকগত তারতম্য-বশতঃ তিনপ্রকার। তাহারা সকলেই মায়াতীত ও সকলেরই কর্মমল কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু অধিকারমল কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাহারা শিবসাম্য-রূপ পূর্ণত্বলাভ করিতে পারে নাই—

উত্তীর্ণমায়াম্বুধয়ো ভগ্নকর্মমহার্গলাঃ।
অপ্রাপ্তশিবধামানস্ত্রিধা বিজ্ঞানকেবলাঃ॥

এই তিনপ্রকার বিজ্ঞানাকল আত্মার নাম ও পরিচয় এইরূপ—

(১) বিদ্যাতত্ত্বনিবাসী মন্ত্র ও বিদ্যা। ইহারা সংখ্যায় সাতকোটি—সকলেই বিদ্যেশ্বরবর্গের নিযোজ্য। ইহাদের বাসস্থান বা ভুবন বিদ্যাতত্ত্বে বিদ্যমান। বিদ্যেশ্বরগণ স-কলাদি পাশবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার সময় এই সকল মন্ত্র ও বিদ্যানামক বিজ্ঞানাকল আত্মাকে বা দেবতাকে স্বকীয় অনুগ্রহকার্যের করণ-রূপে ব্যবহার করেন। বিদ্যেশ্বরগণ পঞ্চকৃত্যকারী বলিয়া তাঁহাদেরও অনুগ্রাহকত্ব আছে। বিদ্যাভুবনসকল পর পর অবস্থিত; দেহ, ভোগ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎকর্ষ ঊর্ধ্বস্থ ভুবনসকলে ক্রমশঃ অধিক।

জ্ঞান, যোগ, সন্ন্যাস প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অথবা ভোগের দ্বারা কর্মরাশি ক্ষীণ হইলে ঐসকল কর্মের ফলভোগের সাধনভূত মায়িক সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের আত্যন্তিক বিশ্লেষ হয়। আত্মা তখন কৈবাল্য প্রাপ্ত হইয়া মায়র ঊর্ধ্বে শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অণু-রূপে অবস্থান করে। তখন কর্ম ও মায়া কাটিয়া গেলেও মল অবশিষ্ট থাকে। এই মল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মার পশুত্ব ঘুচিয়া শিবত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। মল পরিপক্ব না হইলে তাহার অপগম অসম্ভব। তাই এই সকল আত্মা মায়াতীত হইয়াও, কেবলীভাব প্রাপ্তি করিয়াও, অপরা-মুক্তি পর্যন্তও লাভ করিতে পারে না, পরা-মুক্তি তো দূরের কথা।

সৃষ্টির আদিতে এই সকল অণু বা আত্মার মধ্যে যাহাদের মল অল্প বা অধিক পরিমাণে পক্ব হইয়াছে, ভগবান্ স্বয়ং তাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন অর্থাৎ স্ব স্ব মলপাকানু-রূপ জ্ঞানক্রিয়াশক্তি উন্মীলিত করিয়া দেন এবং মন্ত্র ও মন্ত্রেশ্বরাদি পদে শুদ্ধ অধ্বাতে ভোগ ও অধিকার কার্যে নিয়োজিত করেন। তবে ইহাদের মধ্যে যাহার অত্যন্ত শুদ্ধ, তাহারা একেবারে পরতত্ত্বে বা শিবতত্ত্বে নিয়োজিত হয়। যে-সকল আত্মার যথোচিত মলপাক হয় নাই বলিয়া আবরণ অত্যন্ত গভীর তাহারা বিজ্ঞানকৈবল্য-অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যরূপা সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তি এই অবস্থায় সুপ্ত থাকে, তাই কৈবল্য অবস্থাতেও পশুত্ব ঘুচিয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি ঘটে না। এই সকল কেবলী আত্মা কর্মহীন বলিয়া যেমন মায়াকার্যকে বা মায়িক জগৎকে অতিক্রম করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি শক্তিপাতের অভাববশতঃ মহামায়া বা বিন্দুর কার্যস্বরূপ বিশুদ্ধ অধ্বা বা জগৎকে এখনও প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা মধ্যস্থ। আত্মা স্বরূপতঃ বিভু বলিয়া বিজ্ঞানকেবলিগণের

এই মাধ্যস্থ্য ঔপচারিকমাত্র। কৈবল্য যে তন্ত্রসম্মত মুক্তি নহে ইহার আলোচনা সময়ান্তরে হইবে।

(২) ঈশ্বরতত্ত্ববাসী বিদ্যেশ্বর—ইঁহারা সংখ্যায় আটটি; তন্মধ্যে অনন্তই প্রধান। ইঁহাদের আটটি ভুবন ঈশ্বরতত্ত্বেই বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যেও পর পর গুণাদির আধিক্য লক্ষিত হয় অর্থাৎ যেমন শিখণ্ডী হইতে শ্রীকণ্ঠের গুণ অধিক। তাঁহার ভুবন, ভোগ, দেহ, করণ প্রভৃতিও শ্রেষ্ঠ। এইপ্রকার শ্রীকণ্ঠ হইতে ত্রিমূর্তি অধিক শক্তিশালী। বিদ্যেশ্বরগণের মধ্যে অনন্তই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরমেশ্বর। ইঁহাদের মল প্রশান্ত, শুধু অধিকার-মল কিঞ্চিৎমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইঁহারা সকলেই শিবানুগৃহীত। এই প্রশান্তমলত্ব, অধিকারমলসম্বন্ধ ও শিবানুগৃহীতত্ব মন্ত্রবর্গেরও আছে। তবে বিদ্যেশ্বরগণ পঞ্চকৃত্যকারী বলিয়া জীবোদ্ধার-ব্যাপারে অনুগ্রহের কর্তা এবং মন্ত্রবর্গ অনুগ্রহের করণ—এইমাত্র পার্থক্য। বিদ্যেশ্বরগণ সম্বন্ধে রৌরবাগমে আছে—ইঁহারা

'সৃষ্টিসংরক্ষণাদানভাবানুগ্রহকারিণঃ।
শিবার্ককরসম্পর্কবিকাশাত্মীয়শক্তয়ঃ'॥

(৩) সদাশিবতত্ত্বস্থ ভুবনবাসী পশু বা সংস্কার্য সদাশিব। ইঁহারা সদাশিব বা অধিকারাবস্থাপন্ন শিবের ন্যায় কৃত্যকারক ও সদাশিবতত্ত্বাশ্রিত বলিয়া 'সদাশিব' নামে পরিচিত। ইঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে শুদ্ধ অধ্বার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।

শুদ্ধ অধ্বাতে বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই তিনটি তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তৃবর্গসহ মুখ্য অষ্টাদশটি ভুবন আছে। প্রত্যেকটি ভুবনে তৎ-তৎ-ভুবনের অধীশ্বরও আছেন। তাহা ছাড়াও সেখানে অসংখ্য আত্মা বাস করিয়া থাকে। এই সকল আত্মার মধ্যে কেহ কেহ তৎ-তৎ-ভুবনাধিষ্ঠাতার আরাধনা দ্বারা ও কেহ কেহ দীক্ষার প্রভাবে ঐ সকল ভুবনে স্থান লাভ করিয়াছে। সূক্ষ্ম স্বায়ম্ভুব আগমে আছে—

'যো যত্রাভিলষেদ্ ভোগান্ স তত্রৈব নিয়োজিতঃ।
সিদ্ধিভাক্ মন্ত্রসামর্থ্যাৎ'।

স্বচ্ছন্দতন্ত্রেও এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে।

এখন প্রলয়াকল ও স-কল নামক পশু-আত্মার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া উপস্থিত এ-প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রলয়কালে ঈশ্বর মায়াতে সকল কার্যের উপসংহার করিয়া বর্তমান থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। প্রলয়ের উদ্দেশ্য দীর্ঘকাল সংসারে পরিভ্রমণবশতঃ শ্রান্ত আত্মাকে বিশ্রামদান, তাহাদের কর্মের পরিপাকসাধন এবং অসংখ্য কার্যপরম্পরাপ্রসববশতঃ অপচিতশক্তি মায়ার শক্ত্যুপচয়। প্রলয়ে আত্মার কলাদি ভোগসাধন উপসংহৃত হয়। তখন আত্মা মল ও কর্মাখ্য দুইটি পাশে বদ্ধ হইয়া নবীন সৃষ্টির আরম্ভ পর্যন্ত মায়ামধ্যে বর্তমান থাকে। ইহারাই প্রলয়াকল বা প্রলয়কেবলী জীব। ইহারা কর্মক্ষয়ের

অভাবেও প্রলয়বশতঃ কলাদিহীন হইয়া একপ্রকার কৈবল্যদশাতেই বর্তমান থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের মল ও কর্ম পরিপক্ক হয়, পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহাদের পরা-মুক্তি দান করেন—তখন অধিকারদানের অবসর থাকে না।

মলপাক ও কর্মপাক সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। মলপাকই কর্মপাক; কর্মসকল বিচিত্র। ইহাদের মধ্যে যেগুলি ক্রমশ পক্ক হয় সেগুলি দেহসম্বন্ধ হইলে ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয় আর যেগুলি যুগপৎ পক্ক হয় সেগুলি ভগবানের অনুগ্রহেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেগুলিকে ভোগ করিয়া ক্ষীণ করিতে হয় না।

যে-সকল জীবের মল, কর্ম ও মায়া পরিপক্ক হয় নাই, তাহারা প্রলয়কালে পুনঃসৃষ্টির আরম্ভ পর্যন্ত মূঢ়ের ন্যায় বিশ্রাম করে। পরে যখন ভোগযোগ্য দশা লাভ করে তখন পরমেশ্বর অনন্তনামক পূর্ববর্ণিত বিদ্যেশ্বরে স্ব-শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া তদ্দ্বারা মায়াতত্ত্ব ক্ষোভিত করেন ও অশুদ্ধ অধ্বার সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিতে ঐ সকল অপক্কপাশ জীব কলাদি যাবতীয় ভোগসাধন প্রাপ্ত হইয়া স-কল পশুরূপে আবির্ভূত হয়। ইহাদের ত্রিবিধ পাশই বিদ্যমান থাকে।

এই সকল পশু ব্যতীত আর একপ্রকার স-কল জীব আছেন। ইঁহাদের মল ও কর্ম পরিপক্ক হইলেও ইঁহারা সৃষ্টির প্রারম্ভে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারাই মায়াগর্ভস্থ জগতের অধিকারের জন্য অপর-মন্ত্রেশ্বর পদে স্থাপিত হন ও অনন্তেশ্বরের কৃপায় কলা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন আতিবাহিক দেহ গ্রহণ করিয়া স-কল নামে পরিচিত হন। ইঁহারা জগদ্ব্যাপার-সম্পাদক মায়াগর্ভস্থ আধিকারিক-মণ্ডল।

আতিবাহিক দেহ যে মায়িক দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে শুদ্ধ অধ্বায় মায়ার ঊর্ধ্বে যে সকল আধিকারিকদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদের দেহ বৈন্দব অর্থাৎ মহামায়ার উপাদানে গঠিত। এই সব স-কল আধিকারিকগণেরও পরমেশ্বরানুগ্রহ-প্রাপ্তিকালে সমুদ্ভূত বৈন্দব দেহ আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া ভিতরে বর্তমান থাকিলেও তাহার দ্বারা স-কল পশুর অধিকার বা শাসন চলে না। এইজন্য ঐ বৈন্দব দেহের অধিকরণ-রূপে একটি মায়িক দেহের আবশ্যকতা হয়। এই মায়িক দেহ ও পূর্বোক্ত বৈন্দব দেহ অভিন্নরূপেই প্রতীত হয়। বৈন্দব দেহ বোধক, আর মায়িক দেহ আতিবাহিক হইলেও বস্তুত মোহক। কিন্তু মায়িক দেহ বৈন্দব দেহের সম্বন্ধবশতঃ স্বাভাবিক মোহকত্ব পরিহার করিয়া বোধক-রূপেই আভাসমান হয়। অধিকার্য মন্ত্রবর্গ সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম।

এমনও কোনো কোনো জীব আছে যাহাদের মলপাক না হইলেও পাপকর্মের ক্ষয় ও পুণ্যকর্মের উৎকর্ষবশতঃ এমন সব দেহসম্বন্ধ হয়, যাহার ফলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভুবনে আধিপত্য লাভ করে। এই সকল ভুবন অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইতে কালানল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত।

পূর্বে যে অধিকারিবর্গের বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে তম্মধ্যে সপ্তকোটি মন্ত্রের অন্তর্গত সাড়ে তিন কোটি পরিণতমল মন্ত্র আচার্যদেহে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের অধীন। ইহারা মায়িক অধ্বাতে আপন আপন অধিকার সমাপ্ত করিয়া ঐ অধ্বার উপরমকালে মন্ত্রেশ্বরবর্গের সহিত অথবা তাহাদের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পৃথগ্‌ভাবে শিবসাযুজ্য লাভ করে। অনুগ্রাহ্য জীবে অনুগ্রহশক্তির সঞ্চার করাই ইহাদের অধিকার জানিতে হইবে। এই যে শিবসাযুজ্য ইহা প্রলয়কালে ঘটিয়া থাকে। পূর্বোক্ত সাতকোটি মন্ত্রের বাকি অর্ধাংশ অর্থাৎ সাড়ে তিনকোটি পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে আচার্য-রূপ অধিকরণকে অপেক্ষা না করিয়াই শুদ্ধ বিদ্যার নীচে মায়ীয় অধ্বাতে আপন অধিকার সমাপ্ত করিয়া অপবর্গ লাভ করে। এই অবস্থার উদয় প্রলয়কালে না হইয়া মহাপ্রলয়কালে ঘটিয়া থাকে।

এই সকল মন্ত্র পর ও অপর মন্ত্রেশ্বর কর্তৃক অভিব্যক্ত পরমেশ্বর-শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপন আপন যোগ্যতানুসারে কখনও কাহারও অনুগ্রহ করিয়া থাকে অর্থাৎ করণের কার্য করে।

বিদ্যেশ্বরগণ পরমেশ্বরের ন্যায় পঞ্চকৃত্য করিতে সমর্থ। ইহার কারণ তাহাদিগের সহিত বামাদি নয়টি শক্তি যুক্ত রহিয়াছে। ইঁহাদের দেহ শুদ্ধ যোনি হইতে উদ্ভূত এবং কর্মজন্য নহে। যাহাদিগকে মায়াগর্ভাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদিগকে অপর-মন্ত্রেশ্বর বলে। কলা প্রভৃতি উপাদান দ্বারা তাহাদের দেহ নির্মিত হয়। এই সকল মায়া-গর্ভাধিকারী সংখ্যায় একশত আঠার। ইহারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। কলাতত্ত্বের মস্তকে মণ্ডলীরূপে আছেন আটটি, গুণতত্ত্বে শ্রীকণ্ঠ নামে আছেন একটি, গুণের মস্তকে ব্রহ্মাণ্ডের ধারকরূপে আছেন ক্রোধাদি রুদ্র একশতটি (পূর্বাদি প্রতিদিকে অধিষ্ঠাতা-রূপে দশটি রুদ্র আছেন বলিয়া দশদিকের অধিষ্ঠাতা শতরুদ্র)। সর্বোপরি আছেন শতরুদ্রের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং বীরভদ্র। অনন্তাদির দেহে অভিব্যক্ত স্বয়ং পরমেশ্বর ইহাদের রচনা করেন। কলাদি যোজন বিষয়ে যে কর্তৃত্ব তাহা অনন্তাদিরই, শিবের নহে।

তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মণ্ডলী প্রভৃতি আটজন মায়াগর্ভাধিকারীতে অধিষ্ঠিত হইয়া পরমেশ্বর ব্রহ্মা প্রভৃতি ভুবনেশ্বরকে অনুগ্রহ করেন। এই ব্রহ্মাদি হইতেই সকল জগৎ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চতুর্দশ প্রকার ভূতসর্গ উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মাদির কর্মপাশ নিবৃত্ত হয় নাই; ইঁহারা স-কল অবস্থাতেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'ন। ব্রহ্মাদি অণ্ডমধ্যস্থ সাঞ্জন প্রাধানিক মন্ত্র। ইহারা পূর্ববর্ণিত মন্ত্রের ন্যায় নিরঞ্জন মন্ত্র নহে। কর্মাধীন বলিয়া ইহাদের ঐশ্বর্য আপন আপন অধ্বা পর্যন্ত। ইহারা স-কল ও ভোক্তা হইলেও সাধারণ লোক হইতে বিলক্ষণ। ইহাদের কলাদি নির্মিত শরীর এবং ভোগ দুই-ই অধিকারনিবন্ধন। তাহা ছাড়া ইহাদের জ্ঞানক্রিয়াশক্তির উন্মীলনও সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে। পশুর ন্যায় ইহারা কলার অধীন নহে, কলাই ইহাদের অধীন।

৫

এখন পাশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

আত্মার যে সংসারানুভব হইয়া থাকে তাহার একমাত্র কারণ পাশের সহিত সম্বন্ধ। পাশ অচেতন, চেতনাধীন, পরিণামশীল ও চৈতন্যের প্রতিবন্ধক। মল, কর্ম ও মায়া এই তিন প্রকার পাশের বর্ণনা সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মলই প্রধান। শুদ্ধ আত্ম-সংবিৎ-রূপা চিৎ-শক্তি মলহীন বলিয়া নিজেকে ও অন্যকেও প্রকাশ করিতে সমর্থ। ইহা সর্বদাই অপরিণামী এবং শিবের সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। আগমের দৃষ্টি-অনুসারে ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের ভেদ সত্য, কিন্তু তৎ-তৎ-অর্থের সন্নিধানে আত্মসংবিদের যে তৎ-তৎ-আকারের আরোপ উহা বৌদ্ধজ্ঞানে জায়মান তৎ-তৎ-আকারের ভেদবশতঃ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ জ্ঞান অর্থভেদের সন্নিধিবশতঃ ভিন্ন হইলেও ঐ জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ আত্মশক্তি বা গ্রহীতৃচৈতন্য সর্বদাই একরূপে ভাসমান হয়। উহা নিত্য ও নির্বিকার। এই আত্মসংবিৎ বা পৌরুষজ্ঞানের সহিত বৌদ্ধজ্ঞানের অবিবেকবশতঃ জ্ঞানে নানাত্ব-রূপ ভ্রমের আবির্ভাব হয়। ইহার মূল কারণ পশুত্বসাধক মল—

সা তু সংবিদবিজ্ঞাতা তৈস্তৈর্ভাবৈর্বিবর্ততে।
মলোপরুদ্ধদৃক্‌শক্তের্নরস্যেবোরুরাট্‌ পশোঃ॥

যতদিন পর্যন্ত মলের নিবৃত্তি না হইবে ততদিন পর্যন্ত পশুত্ব ঘুচিবে না এবং শিবত্বের অভিব্যক্তিও হইবে না। দ্বৈত-আগম মতে শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই মলনাশ সম্ভবপর নহে। এই মতে মল দ্রব্যাত্মক, সুতরাং চক্ষুর পটলাদি যেমন অস্ত্রচিকিৎসকের ব্যাপারের দ্বারা নিবৃত্ত হয় তদ্রূপ দীক্ষারূপ ঈশ্বরব্যাপারের দ্বারাই ঐ মল নিবৃত্ত হয়। মলনিবৃত্তির আর কোনো উপায় নাই। স্বায়ম্ভুব আগমে আছে—

দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্ধ্বং শৈবং ধাম নয়ত্যপি।

চিৎ ও অচিতের অবিবেক মল হইতে উদ্ভূত বলিয়া মলনিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ বিবেক সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অবিবেকশতঃ বিবর্তের উদয় হয়—

স পরস্পরসম্বন্ধশ্চিদচিদ্‌গোচরস্তয়োঃ।
অন্যোন্যাধ্যাসসাধ্যত্বাদবিবেককৃতোদয়ঃ॥
*   *   *   *   *
সর্বেষামবিবেকোঽয়মণূনাং মলহেতুকঃ।
ভাতি   *   *   *   *   ॥

মলই আণবপাশ। যদি আত্মার নিত্য ও ব্যাপক চিৎ-শক্তি এই অনাদি পাশের দ্বারা

উপরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে সংসার অবস্থায় ভোগনিষ্পত্তির জন্য কলাদির দ্বারা নিজ সামর্থ্যের উত্তেজন আবশ্যক হইত না এবং মোক্ষের জন্যও পরমেশ্বরের কৃপা বা বলের অপেক্ষা থাকিত না। মল এক হইলেও তাহার শক্তি নানা। এক একটি শক্তি এক একটি আত্মার চিৎ-ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিয়া থাকে, সুতরাং মুক্তির যৌগপদ্য ঘটিবার প্রসঙ্গ হয় না। মল-শক্তিসকল স্বকীয় রোধ ও অপসরণ ব্যাপারে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু ভগবৎ-শক্তির অধীন।

এই জন্য ভগবৎ-শক্তিও উপচারবশতঃ নানারূপে ব্যবহৃত হয়। এই শক্তি স্বাধিকার-কাল পর্যন্ত চৈতন্যের রোধিনী মলশক্তিসমূহের পরিণাম সম্পাদন করিয়া তাহাদের নিগ্রহ ব্যাপারের অনুবর্তন করে। তখন ইহার নাম হয় তিরোধান শক্তি। আর যখন সর্বানু-গ্রহশীল নিত্যোদ্‌যুক্ত ঈশানাখ্য সদাশিবমস্তক হইতে প্রসৃত মোক্ষপ্রকাশিকা জ্ঞানপ্রভা দ্বারা অণুবর্গের আশয়ের উন্মীলন করেন তখন ঐ শক্তির নাম হয় অনুগ্রাহিকা শক্তি। মলের অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হইতে পারে না। মলের এই অধিকারসমাপ্তি স্ব-পরিণামসাপেক্ষ। মল পরিণামযোগ্য হইলেও স্বতঃ অর্থাৎ আপনা আপনি পরিণত হইতে পারে না, কারণ অচেতন বস্তু সর্বদা ও সর্বথা চিৎ-শক্তির প্রযোজ্য। এই জন্য ঐশী শক্তির প্রভাবেই মল পরিণত হইয়া থাকে।

মলাখ্য প্রধান পাশের শাস্ত্রীয় নামান্তর নীহার, অঞ্জন, অবিদ্যা, মূর্ছা, আবরণ ইত্যাদি। **কর্মাখ্য পাশ** সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ইহা ধর্মাধর্মাত্মক ও অদৃষ্ট, বীজ প্রভৃতি নামে পরিচিত। কর্মসন্তান প্রবাহরূপে অনাদি ও সূক্ষ্মদেহের মধ্যাবয়বভূত বুদ্ধিতত্ত্বে আশ্রিত।

মায়াখ্য পাশ মায়াতত্ত্ব হইতে ভিন্ন। সৃষ্টির আদিতে যখন মন্ত্রেশ্বর কর্তৃক মায়াতত্ত্বের ক্ষোভ হয় তখন উহা হইতে কলা, বিদ্যা প্রভৃতি তত্ত্ব সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে পরিণতি লাভ করে। কলা হইতে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বের সমষ্টিই মায়ার স্বরূপ। পুর্যষ্টক, সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি মায়ারই নামান্তর। ইহা প্রত্যাত্মনিয়ত এবং প্রলয় বা মোক্ষকাল পর্যন্ত জীবের ভোগ-সাধন-রূপে নিম্নবর্তী ভুবনসকলে কর্মানুসারে পর্যটনশীল। মায়াতত্ত্ব ও মায়া ঠিক এক নহে। মায়াখ্য তত্ত্বপংক্তি সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুইপ্রকার। সাধারণ মায়া অতি বিস্তৃত ও সর্বাত্মভোগ্য ভুবনসকলের আধার-স্বরূপ। এই মায়া বিন্দুর বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি নামক তিনটি কলাতে প্রায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। বিদ্যা-কলাতে মায়া, কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ ও প্রকৃতিসংজ্ঞক সাতটি ভুবনাধার আছে, যাহাতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভুবন হইতে বামদেব নামক ভুবন পর্যন্ত সাতাশটি ভুবন অবস্থিত। প্রতিষ্ঠা-কলাতে গুণ হইতে জল পর্যন্ত তেইশটি তত্ত্বরূপী ভুবনাধার আছে। এই সকল আধারে শ্রীকণ্ঠ ভুবন হইতে অমরেশ ভুবন পর্যন্ত ছাপ্পান্নটি ভুবনের সন্নিবেশ আছে। নিবৃত্তি-কলাতে শুদ্ধ পৃথিবী-তত্ত্ব আছে—ইহা ভদ্রকালীপুর হইতে কালাগ্নিভুবন পর্যন্ত একশত আটটি ভুবনের আধার।

এই সাধারণী অতিবিস্তৃতা মায়ার রাজ্যে প্রতি আত্মার ভোগসাধনীভূত সংকোচবিকাশ-শালী সূক্ষ্মদেহাত্মিকা অসংখ্য তত্ত্বসমষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। এই সকল সূক্ষ্মদেহ বা পুর্যষ্টকই পূর্ববর্ণিত অসাধারণী মায়া। তৎ-তৎ-ভুবন-জন্য স্থূলদেহের সঙ্গে যখন এই সকল সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ হয় তখন তৎ-তৎ-কর্মসন্তানের ভোগযোগ্যতা উৎপন্ন হয়।

মায়াতত্ত্ব নিত্য, বিভু এবং এক হইয়াও বিচিত্রশক্তিময়। ইহাই পরম কারণ। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরশক্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া কলা, কাল ও নিয়তি নামক তিনটি তত্ত্ব উৎপাদন করে। ইহার মধ্যে কলাতত্ত্ব মলশক্তির কিঞ্চিৎ অভিভব করিয়া আত্মার চৈতন্য আংশিকরূপে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার ফলে আত্মার স্বরূপ ঐ ব্যঞ্জকের দ্বারা অনুবিদ্ধ হওয়াতে তাহাতে স্বকীয় ব্যাপারে অল্পমাত্রায় কর্তৃত্বভাবের বিকাশ হয়। মল আত্মাকে রোধ করে না বটে কিন্তু আত্মার শক্তিকে রোধ করে। এই শক্তিই করণ। সুতরাং কলাতত্ত্ব আত্মশক্তির মলাবরণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অপসারিত করিয়া এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মার কর্তৃত্ব উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মাকে স্বীয় কর্মফলভোগে সাহায্যই করে। বুদ্ধিতত্ত্বের উপরঞ্জনই আত্মার ভোগ। ইহা একপ্রকার সংবেদন, যাহার স্বরূপ সুখাদি প্রবৃত্তিসমূহে অভিন্নরূপে ভাসমান।

৬

সমগ্র অশুদ্ধ অধ্বা যে সাক্ষাৎ এবং পরম্পরাভাবে মায়াতত্ত্বের পরিণাম, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অনন্ত নামক বিদ্যেশ্বর দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া মায়া স্বকার্য উৎপাদন করে। মায়াক্ষোভে শিবের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় না। কিন্তু তাঁহার প্রযোজক-কর্তৃত্ব অবশ্যই আছে, কারণ শিবের অধিষ্ঠান ব্যতীত অনন্তাদির কর্তৃত্ব সম্ভবই হয় না। কিরণাগমে আছে—

শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽসিতে প্রভুঃ।

মায়ার এই যে বিচিত্র ভুবনাদিরূপে ও নানাপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদি-রূপে অর্থাৎ কর্মফল-ভোগের সাধন-রূপে পরিণতি হয়, ইহা ত্রিবিধ-বন্ধযুক্ত স-কলাখ্য পশুর জন্য। এই স-কল পশুর অনাত্মায় আত্মাভিমান-রূপ মায়েয় বন্ধ, সুখদুঃখমোহের হেতুভূত অশক্তি প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়াত্মক কর্মবন্ধ এবং পশুত্বসম্পাদক অনাদি আবরণময় আণব বন্ধ বর্তমান থাকে। তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে শরীরী ও অশরীরী আত্মার কর্তৃত্বে কিছু ভেদ আছে। সেইজন্য শিব কর্তৃক স্বশক্তি দ্বারা বিন্দুর বিক্ষোভ এবং অনন্ত কর্তৃক স্বশক্তি দ্বারা মায়ার বিক্ষোভ ঠিক একপ্রকার ব্যাপার নহে। শিবের স্বশক্তি শুদ্ধা সংবিৎ, বিশুদ্ধ নির্বিকল্প জ্ঞান। কিন্তু অনন্তের স্বশক্তি-জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান অর্থাৎ বিকল্প বিজ্ঞান। শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে যে কর্তৃত্ব হইতে পারে না তাহা নহে, কারণ অশরীর আত্মারও স্বদেহস্পন্দাদি বিষয়ে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। আত্মাতে মলসম্বন্ধ থাকিলেই শরীরাদির অপেক্ষা হয়। শিব বস্তুতঃ নির্মল বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব শরীরাদি-নিরপেক্ষ। কিন্তু মায়াধীশ অনন্ত সর্বথা নির্মল নহেন, কারণ তাঁহার অধিকার-মল রহিয়াছে। তাঁহার শরীর বৈন্দবদেহ ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অনন্তাদির এই সবিকল্প জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? আগমের মত এই যে, 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাকার পরামর্শস্বরূপ শব্দোল্লেখ হইতে আত্মার সবিকল্প জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে—

'সবিকল্পকবিজ্ঞানং চিতেঃ শব্দানুবেধতঃ'।

অনন্তের বিকল্প-বিজ্ঞানেও শব্দোল্লেখ আছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা কি প্রকারে ঘটে? তখন তো অশুদ্ধ অধ্বার উৎপত্তি হয় নাই, কারণ মায়া ক্ষুব্ধ হইলে তাহার পরিণাম-স্বরূপে এই অধ্বার উৎপত্তি হয়। এইজন্য তান্ত্রিকগণ স্থূল আকাশকে এই শব্দের অভিব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শিবজন্য বিন্দুক্ষোভ হইতেই এই শব্দ উৎপন্ন হয়। বিন্দুই যে পরব্যোম-রূপা কুণ্ডলিনী, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য চিদাকাশ বা বিন্দুই এই শব্দের উপাদান, মায়িক আকাশ নহে। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা—এই চারিটি শব্দেরই বৃত্তি। পঞ্চভূতের আদি ভূত আকাশ যেমন অবকাশদান ও স্থূল শব্দের অভিব্যঞ্জনের দ্বারা সূর্য-চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতির্মণ্ডলের ভোগ ও অধিকার সম্পন্ন করে, সেইরূপ বিন্দু-রূপ পরম আকাশও অবকাশদান ও শব্দব্যঞ্জন দ্বারা শুদ্ধাধ্ববাসী শিবগণের অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বরূপ শিবত্বযোগী বিদ্যেশ্বরগণ প্রভৃতির ভোগ ও অধিকারের কারণ হইয়া থাকে।

বিন্দুই শব্দের উপাদান বলিয়া পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি স্বীয় শব্দাত্মক বৃত্তিভেদের সম্বন্ধবশতঃ 'ঘটোঽয়ং লোহিতঃ' ইত্যাদি পরামর্শ বিকল্পের উল্লেখপূর্বক সবিকল্প জ্ঞানের উৎপাদন করে। জাত্যাদি-বিশেষণবিশিষ্ট সবিকল্প জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ হইয়াই উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভব বলিয়া ইহাকে পূর্বানুভূত বাসনাত্মক সংস্কার বা ভাবনা-রূপ মনে করিবার কারণ নাই।

এখানে একটি কথা বলিবার আছে। অধ্যবসায় বুদ্ধির কার্য বলিয়া অনেকে সবিকল্প অনুভবকে বুদ্ধির পরিণাম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে অধ্যবসায় বুদ্ধির পরিণাম হইলেও বিন্দুর কার্য শব্দের সহকারবশতঃ বিকল্প-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মায়ার ঊর্ধ্বে বুদ্ধি না থাকিলেও বাক্‌শক্তির দ্বারাই বিদ্যেশ্বর প্রভৃতি শুদ্ধাধ্ববাসীর সবিকল্প অনুভব সিদ্ধ হয়। অতএব অনন্ত যে কিপ্রকারে বিকল্প-জ্ঞানের দ্বারা মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কেহ কেহ অনন্তের এই সবিকল্প জ্ঞানের দ্বারা কর্তৃত্ব অন্যভাবেও উপপাদন করেন। কিন্তু তাহা সর্বত্র স্বীকৃত হয় না বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল না।

৭

পূর্বে বিন্দুর পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি চারিপ্রকার শব্দবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অণু বা জীবমাত্রই এইসকল বৃত্তি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই ব্যাপ্তি তিনপ্রকার বলিয়া কোনো জীবের জ্ঞান উৎকৃষ্ট, কাহারও মধ্যম এবং কাহারও জ্ঞান অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বৃত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপঃ—

(১) **বৈখরী**—ইহা শ্রোত্রগ্রাহ্য ও অর্থের বাচিকা। বায়ু কণ্ঠাদি স্থানসমূহে বিধৃত

হইয়া বর্ণের আকার ধারণ করে। সাধারণতঃ প্রয়োগকালে ইহা প্রাণের বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রযুক্ত হয়। ইহা 'আকাশবায়ুপ্রভব' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে।

(২) মধ্যমা—ইহা প্রাণবৃত্তির অতীত, শ্রোত্রের অগোচর এবং অন্তঃসংজল্পরূপা অর্থাৎ পরামর্শ-জ্ঞানস্বরূপা। ইহা শুদ্ধ বুদ্ধির পরিণাম। ইহা ক্রমবিশিষ্ট ও স্থূল শব্দের কারণ।

(৩) পশ্যন্তী—ইহার নামান্তর অক্ষরবিন্দু। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ এবং বর্ণসকলের অবিভাগবশতঃ ক্রমহীন। এই পশ্যন্তী বাক্‌কে 'ময়ূরাণ্ডরসবৎ' বলিয়া আগমশাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) পরা বা সূক্ষ্মা—ইহার নামান্তর পরনাদ। অনেক স্থানে ইহাকেই অভিধেয়-বুদ্ধির বীজরূপে বর্ণনা করা হয়। ইহা স্বরূপজ্যোতির্ময় ও প্রতিপুরুষে ভিন্ন। সুষুপ্তি অবস্থাতেও এই সূক্ষ্মা বাক্ বিরত হয় না। পুরুষের স্বরূপ হইতে এই বাকের স্বরূপ বিবিক্তরূপে সাক্ষাৎকৃত হইলে পুরুষের ভোগাধিকার নিবৃত্ত হয়। এই বিবেকজ্ঞান উদিত না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ভোক্তাই থাকে, শব্দানুবিদ্ধ জ্ঞানের অতীত বিশুদ্ধ নির্বিকল্পক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

তন্ত্রমতে সাংখ্যসম্মত সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি হইতে আত্মার স্বরূপ-স্থিতি হয় না। এইজন্য সাংখ্যের কৈবল্য আগমশাস্ত্রে মোক্ষ-রূপে গৃহীত হয় না। বস্তুতঃ এই কৈবল্য-অবস্থায় আত্মার পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না এবং শিবত্বের অভিব্যক্তিও ঘটে না। সিদ্ধান্তী-শৈবমতে সাংখ্যসম্মত কেবলী পুরুষে পরাবাকের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। দীক্ষার প্রভাবে মলনিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ও সূক্ষ্মা-বাকের স্বরূপগত অবিবেধ দূর হইতে পারে না।

৮

বিন্দু বিশুদ্ধ সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ। বিচিত্র ভুবনাদি কার্যরূপে বিশুদ্ধ সৃষ্টির বর্ণনা আগমশাস্ত্রের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৃষ্টি বাচ্য ও বাচক অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ উভয়াত্মক। বাচ্য অর্থ যেমন বিন্দু হইতে উদ্ভূত তেমনি বাচক শব্দও বিন্দু হইতেই উদ্ভূত। শব্দের মূল উপাদান-কারণ বিন্দু। বস্তুতঃ এই দৃষ্টি অনুসারে বিন্দু পরনাদ-রূপে গুহ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

বিন্দুর প্রসর বা প্রসরণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহার প্রথমটি নাদ। ইহা পরনাদ হইতে পৃথক্ এবং সূক্ষ্ম-নাদরূপে পরিচিত। পরনাদ সৃষ্টির অতীত। পরমেশ্বরের সমবায়িনী চিদ্রূপা শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখনও ইহা বিদ্যমান থাকে। ইহা বিন্দুর

ক্ষোভ হইতে উৎপন্ন হয় না। বস্তুতঃ ইহা বিন্দুর মূল স্বরূপ; অপর কিছু নয়। সূক্ষ্ম-নাদ অভিধেয়-বুদ্ধির হেতু এবং বিন্দুর প্রথম স্ফুরণ হইতে উদ্ভূত। ইহা চিন্তা-রহিত। কিন্তু বিন্দুর দ্বিতীয় প্রসরণ, যাহাকে সাধারণতঃ **অক্ষরবিন্দু** বলা হয়, তাহা সূক্ষ্ম-নাদের কার্য এবং পরামর্শ-জ্ঞানস্বরূপ। ময়ূরাণ্ডরসে যেমন বিচিত্র বর্ণ অভিন্নরূপে প্রকাশ পায় তদ্রূপ এই অক্ষরবিন্দুতেও পরামর্শজ্ঞানের অনন্ত বৈচিত্র্য নিহিত থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ আচার্যগণ অব্যপদেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। বিন্দুর তৃতীয় প্রসরটি **বর্ণ**। ইহা শ্রোত্রগ্রাহ্য স্থূল শব্দ, যাহা আকাশ ও বায়ু হইতে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিভাগের মূল কালোত্তরতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

স্থূলং শব্দ ইতি প্রোক্তং সূক্ষ্মং চিন্তাময়ং ভবেৎ।
চিন্তয়া রহিতং যত্তু তৎ পরং পরিকীর্তিতম্॥

বিন্দুকে দ্বৈতাগমে নানাস্থানে নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। **শব্দব্রহ্ম, কুণ্ডলিনী, মহামায়া, বিদ্যাশক্তি, অনাহত, ব্যোম** ইত্যাদি নাম বিন্দুরই পর্যায়। বিন্দু জড় হইলেও শুদ্ধ। দ্বৈত তান্ত্রিক-সিদ্ধান্তে শিব বা পরমেশ্বরের সহিত বিন্দুর অথবা মহামায়ার সম্বন্ধ বিষয়ে দুইপ্রকার মত সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রচলিত মতটি এই—

শিবের দুইটি শক্তি—একটি **সমবায়িনী-শক্তি**, অপরটি **পরিগ্রহ-শক্তি**। সমবায়িনী শক্তি চিদ্রূপা, অপরিণামিনী, নির্বিকার ও স্বাভাবিক। ইহারই নামান্তর **শক্তিতত্ত্ব**। এই শক্তি শিবে নিত্য সমবেত থাকে। উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা তাদাত্ম্য নামে বর্ণিত হয়। কিন্তু পরিগ্রহ-শক্তি অচেতন ও পরিণামশীল। ইহারই নামান্তর **বিন্দু**। বিন্দুর শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুইটি রূপ আছে। সাধারণতঃ শুদ্ধ রূপটিকেই বিন্দু বা **মহামায়া বলা হয়**। অশুদ্ধ রূপটির নামান্তর **মায়া**। উভয়েই নিত্য। অশুদ্ধ-অধ্বার উপাদান কারণ মায়া, শুদ্ধ-অধ্বার উপাদান মহামায়া, ইহাই বিশেষ। সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব বা তন্ত্রপ্রসিদ্ধ কলাদি কঞ্চুক সবই অশুদ্ধ-অধ্বার অন্তর্গত। এইগুলি মায়ার কার্য (অবশ্য পুরুষ বা আত্মা নিত্য ও স্বরূপতঃ বিলক্ষণ) এবং মায়ার ঊর্ধ্বস্থিত তত্ত্ব শুদ্ধ-অধ্বার অন্তর্গত।

দ্বিতীয় মতটি এইপ্রকার—এই মতে বিন্দুই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ-অধ্বার উপাদান। এই মতে মায়া নিত্য নহে, কার্য। মহামায়া বা বিন্দুর তিনটি অবস্থা—**পরা, সূক্ষ্মা ও স্থূলা**। পরাবস্থাকে **মহামায়া**, পরা মায়া, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নামে বর্ণনা করা হয়। ইহাই পরম কারণ ও নিত্য। সূক্ষ্ম ও স্থূল দুইটি অবস্থাই কার্য বলিয়া অনিত্য। মহামায়া বিক্ষুব্ধ হইলেই শুদ্ধ ধামসকল ও তন্নিবাসী মন্ত্র (বিদ্যা), মন্ত্রেশ্বর (বিদ্যেশ্বর) প্রভৃতি সকলের শরীর, করণ প্রভৃতি উহা হইতে রচিত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ লোকের সংস্থান ও দেহাদি সবই সাক্ষাৎ মহামায়ার কার্য—শুদ্ধ, মায়াতীত ও উজ্জ্বল।

মহামায়ার সূক্ষ্ম বা দ্বিতীয় অবস্থার নাম **মায়া**। ইহা প্রথম অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া অনিত্য। কলাদি তত্ত্বসমূহের অবিভক্ত স্বরূপকেই মায়া বলে। কলাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে পুরুষ ভোক্তা হইতে পারে না। দ্রষ্টা-পুরুষের ভোক্তৃত্ব উপপাদনের জন্য কলাদির যোগ আবশ্যক হয়। মায়া হইতে কলাদি (তত্ত্ব ও ভুবনাত্মক) এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উদ্ভূত হয়। সমগ্র অশুদ্ধ-অধ্বার কারণ এই মায়া। আগমে ইহাকে এক-

দিকে যেমন জননী বলা হইয়াছে অপরদিকে তেমনি মোহিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহামায়ার স্থূল বা তৃতীয় অবস্থার নাম প্রকৃতি। ইহা ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতি পুরুষের ভোগসাধন তত্ত্বসমূহকে (বুদ্ধি প্রভৃতি) এবং ভোগ্য বিষয়-সকলকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাতে উৎপাদন করিয়া থাকেন। কলাদির সম্পর্কবশতঃ পুরুষ ভোক্তা সাজিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার ভোগ্য ও ভোগসাধন উৎপাদনের জন্য মহামায়া প্রকৃতি-রূপ তৃতীয় বা স্থূল অবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

৯

বিন্দু যে শিবসমবেত নহে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাই প্রচলিত মত। এই মতে বিন্দু পরিণামী বলিয়া জড়াত্মক। তাই চিদাত্মক পরমেশ্বর-স্বরূপে ইহার সমবায় স্বীকৃত হয় না। শিবে বিন্দুর সমবায় স্বীকার করিলে তাঁহার অচেতনত্ব প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—

> স হি তাদাত্ম্যসম্বন্ধো জড়েন জড়িমাবহঃ।
> শিবস্যানুপমাখণ্ডচিদ্ঘনৈকস্বরূপিণঃ॥

কিন্তু তান্ত্রিক দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দু-সমবায়বাদীও ছিলেন। তাঁহাদের মতে শিবের সমবায়িনী শক্তি দুইপ্রকার—একটি দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞানশক্তি, অপরটি ক্রিয়াশক্তি বা কুণ্ডলিনী। ক্রিয়াশক্তির নামান্তর বিন্দু। মায়া অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন—মায়া শিবে সমবেত হয় না। স্বসমবেত জ্ঞানশক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ও স্বসমবেত ক্রিয়াশক্তির দ্বারা তাঁহার জগৎ-রচনা উপপন্ন হয়। জ্ঞানশক্তি তৎ-তৎ-অর্থের বিষয়ীকরণেই চরিতার্থ হয় কিন্তু বস্তুনির্মাণ-রূপ ফল ক্রিয়াশক্তি ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। এই উভয় শক্তিই পরমেশ্বরে অবিনাভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

শুদ্ধ ভুবনের এবং শুদ্ধ দেহ ও করণাদির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এইগুলি বিন্দু বা মহামায়ার পরিণাম, মায়ার পরিণাম নহে। কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনা করিবার পূর্বে বিন্দুর অবস্থাভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। বিন্দুর ক্ষোভ হইতে শুদ্ধ জগৎ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মায়ার ক্ষোভ হইতে অশুদ্ধ জগৎ আবির্ভূত হয়। শিব স্বাত্মসমবেত শক্তির দ্বারা বিন্দুকে আক্রমণ করিলেই বিন্দুর ক্ষোভ হয়, অন্যথা নহে। সুতরাং একমাত্র পারমেশ্বরী শক্তির প্রভাবেই শুদ্ধ জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। কিন্তু মায়ার ক্ষোভ সাক্ষাদ্‌ভাবে শিবশক্তি দ্বারা হয় না। তন্ত্রমতে পরমেশ্বর পঞ্চকৃত্যকারী—সৃষ্টি, পালন, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, এই পাঁচটি কৃত্যের মুখ্য কর্তা একমাত্র পরমেশ্বর, ব্রহ্মাদি দ্বারমাত্র। এই কৃত্যপঞ্চক সম্পাদনের জন্য শুদ্ধ অধ্বার আবশ্যকতা আছে। তাই

বিন্দুক্ষোভেরও প্রয়োজন আছে। শিব এক, তাঁর শক্তিও একই, কিন্তু উপাধিভেদবশতঃ তাঁহাতে ভেদের আরোপ হয়। শৈবী-শক্তি যখন অব্যক্ত তখন তাহা নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ ও সংবিৎ-রূপা। তখন বিন্দুর ক্ষোভ থাকে না। পরবিন্দু-স্বরূপের অধিষ্ঠাতা শিবের এইটি পরাবস্থা।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। প্রচলিত মতে শক্তি এক বলিয়া তাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়ার কোনো ভেদ নাই, যে-ভেদ প্রতীত হয় তাহা ঔপাধিক। তাই জ্ঞানও সদা ক্রিয়ারূপ; সেইজন্য ক্রিয়াশব্দে অনেকস্থলে শক্তিকে বুঝায়। যখন এই শক্তি সকল ব্যাপার উপসংহার করিয়া স্বরূপমাত্রে উপস্থিত হয় তখন শিবকে শক্তিমান্ বলা হয়। ক্রিয়ারূপা শক্তি তখন মুকুলিকাবৎ শিবে অবস্থান করে। ইহাই শিবের পূর্ববর্ণিত লয়া-বস্থা। যখন ঐ শক্তি উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়া উদ্যোগবশতঃ বিন্দুর কার্যের প্রসবাভিমুখ্য সম্পাদন করে ও কার্যোৎপাদন দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞানক্রিয়া সমৃদ্ধ করে, তখন শিবের ভোগাবস্থা। শিবের পরমানন্দ বা ভোগ সুখসংবেদন-রূপ নহে, কারণ মলহীন চিৎসত্তায় উপাধিভূত আনন্দ ও ভোগ সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় শক্তিকে বলা হয় উদ্‌যুক্ত এবং তাঁহার সঙ্গে আছেন বলিয়া শিবকেও বলা হয় উদ্‌যুক্ত—

স তয়া রমতে নিত্যং সমুদ্‌যুক্তঃ সদাশিবঃ।
পঞ্চমন্ত্রতনুঃ শ্রীমান্ দেবঃ সকলনিষ্কলঃ॥

লয়াবস্থাপন্ন শিবকে বলা হয় নিষ্কল এবং ভোগাবস্থায় তাঁহাকে সকল-নিষ্কল বলা হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার একটি অধিকার-অবস্থা আছে, যাহার বর্ণনা পরে করা হইবে। এই অবস্থায় তিনি স-কল। শিবের এই অবস্থাভেদ ঔপচারিক, বাস্তব নহে। শক্তি বা কলার অবিকাশ দশা, বিকাশোন্মুখ দশা এবং পূর্ণ-বিকাশ দশা অনুসারে শিবের অবস্থাভেদ কল্পিত হয়।

শিব-শক্তির এই লয়াদি অবস্থাভেদের মূলে বিন্দুর অবস্থাভেদ রহিয়াছে। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা কলা বিন্দুরই পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা। তন্মধ্যে শান্ত্যতীত কলা বিন্দুর স্বরূপ বলিয়া ধরা চলে। ইহা অক্ষুব্ধ বিন্দু বা লয়াবস্থা। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যাবতীয় ভোগাধিষ্ঠান শান্তি প্রভৃতি চারি কলার পরিণামস্বরূপ। বস্তুতঃ ভোগস্থান বলিতে শান্তি প্রভৃতি কলাচতুষ্টয়ের ভুবনই বুঝিতে হইবে। শান্ত্যতীতরূপ পরবিন্দু কলাসমূহের কারণাবস্থা বা লয়াবস্থা। তাই শান্ত্যতীত ভুবন ঠিক ভোগস্থান নহে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভেই শান্ত্যতীত ভুবন উৎপন্ন হয় বলিয়া কোনো কোনো স্থানে তাহাকেও ভোগ-স্থানের মধ্যে গণ্য করা হয়; তবে উহা ভোগের বীজাবস্থা।

কলা-রূপা শক্তিই শিবের দেহরূপে ব্যপদিষ্ট হয়। তাই লয়াবস্থায় শিবকে বা নিষ্কল শিবকে অশরীর বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ভোগাবস্থায় শিব সকল-নিষ্কল—তখন তাঁহার দেহ পঞ্চমন্ত্রাত্মক। তন্ত্রমতে শক্তিই মন্ত্র—

মননাৎ সর্বভাবানাং ত্রাণাৎ সংসারসাগরাৎ।
মন্ত্ররূপা হি তচ্ছক্তির্মননত্রাণরূপিণী॥

এই মন্ত্ররূপা শক্তি মূলে এক—ভেদ শুধু ঔপাধিক। কার্যভেদে অধিষ্ঠানবশতঃ একই শক্তি পঞ্চধা প্রতিভাত হয়। তদনুসারে বিন্দুভুবনের অধিষ্ঠাতৃ-শক্তিকে **ঈশানমন্ত্র** এবং শান্ত্যাদি ভুবনচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিসকলকে যথাক্রমে **তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব** ও **অঘোর মন্ত্র** বলা হয়। এই ভুবনগুলি ভোগস্থান। ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা শক্তি তনু বা দেহের কার্য করে বলিয়া তাহাকে **শিবতনু** বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা পারমার্থিক দেহ নহে। এই পঞ্চ মন্ত্র পরমেশ্বরের পঞ্চকৃত্যের উপযোগী। বিন্দুকলাগুলি কারণাবস্থায় লীন থাকিলে ঐ অবস্থাকে পরবিন্দু বলে। তখন কলাসকলের পরস্পর কোনো বিভাগ থাকে না। এই পরবিন্দুর অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই শিবের পরা মূর্তি। ইহা লয়াবস্থার কথা। যখন শিবকে অশরীর বলা হয়, তখন এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হয়। শক্তি তখন লীন এবং বিন্দু অক্ষুব্ধ, অসৎকল্প, একমাত্র শিবই তখন স্ব-মহিমায় বিরাজমান।

বিন্দুকলাগুলি যখন কার্যাবস্থায় বর্তমান, তখন তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে শিবের অপরা মূর্তি বলে। ভোগস্থান-রূপে যে-সকল কলাভুবনের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিবৃত্তিভুবন সর্বাপেক্ষা নিম্নতম। এই নিবৃত্তিভুবনের অধোবর্তী ভুবনের নাম সদাশিব-ভুবন। ইহার অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি শিবের অপরা মূর্তি বা **সদাশিবতনু**। শিবের এই সদাশিব-দেহ বা নাম ঔপচারিক, সদাশিব-ভুবনের অধিষ্ঠানবশতঃ ইহার উদ্ভব। দীক্ষাদির দ্বারা যে সকল জীব তৎ-তৎ-ভুবন প্রাপ্ত হয় তাহাদের ভেদ সত্য, কিন্তু শিব ও শক্তির ভেদ কার্যভেদবশতঃ ঔপাধিক—

অধিকারী স ভোগী চ লয়ী স্যাদুপচারতঃ।

অর্থাৎ শিবশক্তিক্ষোভিতা মহামায়া যে-যে কার্য উৎপাদন করেন, তাহাতে তদধিষ্ঠাতা শিব ও শক্তি উভয়ের কার্যভেদবশতঃ এবং স্থানভেদবশতঃ উপচারনিবন্ধন তৎ-তৎ-সংজ্ঞার ব্যপদেশ হয়। যেমন শান্তি-ভুবনের অধিষ্ঠান ও উৎপাদনবশতঃ শক্তি ও শিব যথাক্রমে শান্তা ও শান্ত-সংজ্ঞা লাভ করেন। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

মৃগেন্দ্রাগমে আছে—

কিন্তু যঃ পতিভেদোঽস্মিন্ স শাস্ত্রে শক্তিভেদবৎ।
কৃত্যভেদোপচারেণ তদ্ভেদস্থানভেদতঃ॥

অধিকারাবস্থাপন্ন শিব স-কল। তিনি বিন্দু হইতে অবতীর্ণ এবং **অণুসদাশিব** বা **পশুসদাশিবগণ** কর্তৃক সমাবৃত। এই সকল সদাশিব বস্তুতঃ অণু বা পশু আত্মা, শিবাত্মা নহেন। ইঁহাদের আণবমল কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাই ইঁহাদের জ্ঞানক্রিয়ারূপা শক্তির কিঞ্চিৎ সংকোচ এখনও রহিয়া গিয়াছে। ইঁহারা শিবের ন্যায় পূর্ণভাবে অনাবৃতশক্তি নহেন। যদিও ইঁহারা মুক্ত পুরুষ তথাপি সর্বথা মলহীন না হওয়ার জন্য এখনও পরা-মুক্তি বা শিবসাম্য লাভ করেন নাই। সদাশিব-ভুবনের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পরমেশ্বরকেও সদাশিব বলে, কিন্তু তিনি স্বয়ং শিব। তিনি পূর্ববর্ণিত অণুসদাশিববর্গকে আপন আপন ভুবন-ভোগে নিয়োজিত করেন এবং বিদ্যেশ্বর বা মন্ত্রেশ্বরগণকে আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে অশুদ্ধ অধ্বার অধিকারে নিয়োজিত করেন। এই দ্বিবিধ নিয়োজন-ব্যাপারই অধিকারাবস্থ

শিব বা স-কল শিবের কার্য। ইহাই তাঁহার প্রেরকত্ব ও প্রভুত্ব। এই সদাশিবরূপী শিব সমগ্র জগতের প্রভু-রূপে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যাবতীয় অধ্বার মূর্ধদেশে বিরাজমান আছেন। যোগিগণ এইভাবেই তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন।

মায়ার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ অধ্বাতে বহুসংখ্যক ভুবন আছে। প্রতি ভুবনে তদনুরূপ দেহ, করণ প্রভৃতি এবং ভোগ্যাদি আছে। এই সবই বিশুদ্ধ বৈন্দব উপাদানে রচিত। ইহার মধ্যেও ভুবনের ঊর্ধ্বাধোভেদে ক্রমোৎকর্ষ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শুদ্ধ-বিদ্যাতে যে বামা, জ্যেষ্ঠ প্রভৃতির ভুবন আছে, তাহার মধ্যে বামা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠার ভুবনের উৎকর্ষ অধিক, তদ্রূপ জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা রৌদ্রীর ভুবনের উৎকর্ষ অধিক। এই বিদ্যাতত্ত্বেই সাতকোটি মন্ত্রের ও তদধীশ্বরী সাতটি বিদ্যারাজ্ঞীর অধিষ্ঠান। ঈশ্বরতত্ত্বে আটটি বিদ্যেশ্বর স্ব স্ব পুরে সর্বোপরি অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে শিখণ্ডী সর্বনিম্নে ও অনন্ত সর্বোপরি অবস্থিত। ইহাদের মধ্যেও পূর্ববৎ ক্রমোৎকর্ষ আছে। সদাশিবতত্ত্বেও ঠিক এইরূপ। এখানে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

১০

এখন পরমেশ্বরের **পঞ্চকৃত্য** ও **দীক্ষাতত্ত্ব** সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে।

পরমেশ্বর নিত্য নির্মল, সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা, ইহা বলা হইয়াছে। তিনি পতি ও পরশিব নামে তান্ত্রিক গ্রন্থে অভিহিত হ'ন। পক্ষান্তরে পশু-আত্মা মল, কর্ম ও মায়াখ্য পাশ দ্বারা আবদ্ধ। পরমেশ্বর অনুকম্পাবশতঃ এই সকল পাশাত্মক বন্ধন অপসারণ করিয়া পশু-আত্মাকে নিজের মত করিয়া লন। ইহাই পশুর শিবসাধর্ম্যাভিব্যক্তি-রূপ অনুগ্রহ বা মোক্ষ। পশুগণের চৈতন্য-উপরোধক অনাদি মলের অধিকার যতদিন নিবৃত্ত না হয়, ততদিন অনুগ্রহের প্রবৃত্তি হয় না। মৃগেন্দ্র-আগমে আছে—

তমঃশক্ত্যধিকারস্য নিবৃত্তেস্তৎপরিচ্যুতৌ।
ব্যনক্তি দৃক্‌ক্রিয়ানন্ত্যং জগদ্বন্ধুরণোঃ শিবঃ॥

মল দ্রব্যাত্মক বলিয়া তাহার নিবৃত্তি ঈশ্বরের ব্যাপারবিশেষ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই ব্যাপারবিশেষকে দীক্ষা বলে। মল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ইহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। মলপাকের উদ্দেশ্যেই পরমেশ্বর পুরুষকে অলক্ষিতভাবে মায়িক অর্থের সম্বন্ধনিমিত্ত অনাদি কর্মভোগাত্মক সংসার প্রাপ্ত করান। ইহাই তাঁহার **তিরোধান** নামক কৃত্য, যাহা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিনেরই অনুগত। তিরোধানের নামান্তর **রোধ**।

মল, মায়া ও কর্ম তিনেরই পাক আবশ্যক। মলপাকের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মায়াশক্তিসমূহকে অভিব্যক্তির যোগ্য করাই মায়াপাকের উদ্দেশ্য। এইরূপ কর্মও পরিপক্ক

হইলেই স্বীয় ফলদানে সমর্থ হয়, অপক্ক কর্ম ফলদায়ক হয় না। মলাদি ত্রিবিধ পাশেরই পাক বা পরিণামের কারণ পরমেশ্বরের সামর্থ্য বা স্বাতন্ত্র্য। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ—এই পঞ্চবিধ কৃত্যকারী পরমকারুণিক পরমেশ্বরই উপাস্য-রূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট। দীক্ষাশুদ্ধ আত্মাই তাঁহার উপাসক। এই প্রকার আত্মাই পরমেশ্বরের সাম্যলাভ করিতে সমর্থ হয়।

অনেক জন্মের বাসনায় ও পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো আশ্রমে অবস্থানকালে অচিন্ত্য-ভাগ্যোদয়বশতঃ কোনো আত্মার অনাদি চৈতন্যের আবরণস্বরূপ মলের কিঞ্চিৎ পাক হইলে মন্দতর শক্তিপাত ঘটিয়া থাকে। ইহারই নাম **কৃপা** বা **অনুগ্রহ**। ইহার মাত্রানুসারে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাদির উদয় হয়। তখন শিবহস্তার্পণ-রূপ **প্রথম** দীক্ষার অবসর আসে। কর্মসমষ্টির পরিপাক সম্পাদনই এই দীক্ষার উদ্দেশ্য। গুরুশুশ্রূষা, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রভৃতি এই দীক্ষাসংস্কারের পর সম্ভবপর হয়। ইহার নাম **সময়দীক্ষা**।

ইহার পর আত্মার অধঃস্থ মল পাক হইলে তদনুরূপ কিঞ্চিৎ-মাত্রাতে শক্তিপাত হয়। এই শক্তিপাতের মাত্রানুসারে **বিশেষদীক্ষা** নামক **দ্বিতীয় দীক্ষার** অবসর ঘটে। এই দীক্ষার ফলে ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদ্রেক হয় ও কর্মাদি পাশ ক্ষয়োন্মুখ হয়। ইহার উদ্দেশ্য মন্ত্রগ্রহণ, শিবলিঙ্গার্চন প্রভৃতির যোগ্যতাসিদ্ধি। এই দীক্ষাতে বাগীশ্বরীগর্ভজন্ম-রূপ দ্বিতীয় জন্ম নিষ্পন্ন হয়। এই দীক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ **পুত্রক** নামে পরিচিত হয়।

ইহার পর মলপাক আরও বিশিষ্টভাবে সম্পন্ন হইলে তীব্রতর ভগবৎ-শক্তির সঞ্চার হয়। তদনুসারে **নির্বাণদীক্ষা** নামক **তৃতীয় দীক্ষার** অবসর ঘটে। ইহার উদ্দেশ্য নিত্যাদি সমস্ত শিবধর্মের অনুষ্ঠানসিদ্ধি। ইহার ফলে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ছয়টি ঐশ্বরিক গুণের বা ষাড়্‌গুণ্যের উন্মেষ হয় এবং কলাদি ছয়টি অধ্বার বিশুদ্ধতাবশতঃ পূর্ণ-রূপে সর্বপাশের ছেদ হয়। যিনি এই তৃতীয় দীক্ষা লাভ করেন তাঁহার পক্ষেই সিদ্ধান্তজ্ঞানসাধন সুকর হয়, কারণ এইপ্রকার দীক্ষাপ্রাপ্ত আত্মাতেই পশুত্বের নিবৃত্তি হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হইতে পারে। প্রথম দীক্ষা ও দ্বিতীয় দীক্ষার ফলে পশুত্বের অপগম হয় না।

সময়ীর পূর্বজাতিসম্বন্ধ থাকে বলিয়া পশুত্বের নিবৃত্তি হয় না। পুত্রক বাগীশ্বরী-গর্ভ হইতে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে বলিয়া তাহার পূর্বজাতিসম্বন্ধ থাকে না বটে, কিন্তু পশুত্বাপগম তাহারও ঘটে না, কারণ শুধু বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিলেই শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না, যেহেতু তখনও আণব মল বিদ্যমান থাকে। মল পরিপক্ক হইলে বিশিষ্ট সংস্কারের ফলে শিবত্বের উন্মেষ সম্ভবপর। তাহার জন্য সময় অপেক্ষিত। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই মলপাক হয় না।

দীক্ষা সম্বন্ধে তান্ত্রিক দর্শনের আরও দুইচারিটি কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

সময়ীর প্রসঙ্গে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে আপাততঃ তাহাই পর্যাপ্ত। এই প্রাথমিক দীক্ষার ফলে পূর্ণত্ব লাভ না হইলেও ইহারও যে সার্থকতা আছে, তাহা বিভিন্ন তান্ত্রিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। তদনুসারে এই দীক্ষার প্রভাবে ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাতৃকারণ-পঞ্চকের বিশ্লেষ ঘটে ও তদনন্তর ঈশ্বরত্ব-লাভের যোগ্যতা-প্রাপ্তি হয়। ইহার চরম ফল ঐশ্বরিক-পদলাভ। সময়ী চর্যা ও ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকাদি-পদপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ভেদে দুইপ্রকার। তদনুসারে তাঁহাদের দীক্ষাও দুইপ্রকার। **বুভুক্ষু** সাধক ভোগার্থী বলিয়া **ভৌতিক দীক্ষার** অধিকারী। তাঁহারা এই দীক্ষার প্রভাবে শুদ্ধ জগতে বিচিত্র ভুবন ও ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হ'ন। এই সকল পূর্বোক্ত বিন্দুরই পরিণামমাত্র। কিন্তু যাঁহারা মুমুক্ষু অর্থাৎ মোক্ষার্থী তাঁহারা আনন্দময় বৈন্দব-রাজ্যের ভোগে বীতস্পৃহ। এই সকল সাধক **নৈষ্ঠিক দীক্ষার** অধিকারী। এই দীক্ষার প্রভাবে শিবশক্তিময় সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার জন্মে। এইজন্যই আগমে কলা প্রভৃতি ছয়প্রকার অধ্বার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন সময়ী-দীক্ষার পর ভোগার্থীর ও মোক্ষার্থীর দীক্ষা আলোচ্য। তন্মধ্যে ভোগার্থী সাধক দুইপ্রকার—প্রথম **শিবধর্মা** ও দ্বিতীয় **লোকধর্মা**। তদনুসারে **সাধকদীক্ষাও** শিবধর্মিণী ও লোকধর্মিণী ভেদে দুইপ্রকার। শিবধর্মী সাধক মন্ত্রতন্ত্রের রহস্যবিৎ ও অভিষিক্ত হন। এই দীক্ষা সম্বন্ধে মৃগেন্দ্রাগমে আছে—

শিবধর্মিণ্যণোর্মূলং শিবধর্মফলশ্রিয়ঃ।

এই দীক্ষার প্রভাবে কোনো কোনো সাধক মন্ত্র ও মন্ত্রেশ্বর প্রভৃতি পদ লাভ করেন। ইহা ব্যতীত কেহ কেহ এই দীক্ষার ফলস্বরূপ মায়াতীত ভোগভূমিসমূহে প্রলয়ের সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল দেহ এবং আনুষঙ্গিক বহু সিদ্ধি লাভ করেন। লোকধর্মিণী দীক্ষাতে মন্ত্রারাধনা নাই। লোকধর্মী সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া লোকমার্গে শ্রুতিস্মৃতিনির্দিষ্ট আলয়ে অবস্থান করিয়া ইষ্টাপূর্তবিধানে রত থাকেন। ইনি শুভ কর্ম করেন বলিয়া মন্ত্রারাধন না করিলেও ইঁহাকে সাধক বলা হয়: 'শুভকর্মণৈব ফলস্য সাধনাৎ সাধকো ঽয়ম্'।

ভোগভূমিষু সর্বাসু দুষ্কৃতাংশে হতে সতি।
দেহান্তরাণিমাদ্যর্থং শিষ্টেষ্টা লোকধর্মিণী॥

এই দীক্ষার প্রভাবে সাধকের সঞ্চিত অশুভ কর্মসকল-মাত্র নষ্ট হয় ও সঞ্চিত শুভ কর্ম-সকলের অণিমাদি সিদ্ধিতে পর্যবসান হয়, কিন্তু প্রারব্ধ-কর্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। প্রারব্ধফল দেহ ভোগাবসানে পতিত হইলে দীক্ষিত সাধক অণিমাদি ভোগের জন্য গুরু কর্তৃক ঊর্ধ্বলোকে চালিত হন। সেখানকার ভোগ সমাপ্ত হইলেও ভোগবাসনা অতৃপ্ত থাকিলে ঐ বাসনার অনুরূপ ভোগের জন্য লোকান্তরে নীত হন। এইরূপ শুভকর্মের ভোগের অন্তে বৈরাগ্যের উদয় হইলে ঐ স্থান হইতেই পরমেশ্বরের নিষ্কল-স্বরূপে যোজিত হন। বলা বাহুল্য, নিষ্কলে যোজনা না হইয়া মায়াতীত বিভিন্ন শুদ্ধ ভুবনের অন্তর্গত কোনো ভুবনের অধিষ্ঠাতার সঙ্গেও সাযুজ্যাদিফলক বিভিন্ন প্রকার যোজনাও হইতে পারে। এই সব অবস্থালাভ সাধকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। তাই তন্ত্রে আছে—

লোকধর্মিণমারোপ্য মতে ভুবনকর্তরি।
তদ্ধর্মাপাদনং কুর্যাচ্ছিবে বা মুক্তিকাঙ্ক্ষিণাম্॥

এই যে ঊর্ধ্বগতি ও যোজনের কথা বলা হইল ইহা যথাক্রমে সাধক ও গুরুর অভিসন্ধিবশতঃ হইয়া থাকে।

মুমুক্ষুর দীক্ষা সবীজ, নির্বীজ ও সদ্যোনির্বাণদ—এই তিন প্রকার। বস্তুতঃ তৃতীয় দীক্ষাও নির্বীজেরই প্রকারবিশেষ বলিয়া মোটামুটি মোক্ষদীক্ষা দ্বিবিধ।

সাধারণতঃ **নির্বীজ দীক্ষা** বালক, মূর্খ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি লোকের জন্য, অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিচারে কুশল নহে এবং যাহাদের ব্রহ্মচর্যাদি ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই তাঁহাদিগের জন্যই নির্বীজ দীক্ষা। ইহাদিগের পক্ষে সময়াচার পালনের আবশ্যকতা নাই। এই দীক্ষার প্রভাবে শুধু গুরুভক্তি হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে আছে—

দীক্ষামাত্রেণ মুক্তিঃ স্যাদ্ ভক্তিমাত্রাদ্ গুরোঃ সদা।

এই ক্ষেত্রে গুরুভক্তিমাত্রই সময়, অন্য সময় নাই।

সদ্যোনির্বাণদা দীক্ষার কথা বলা হইয়াছে। ইহা মুমূর্ষু অবস্থায় বিধেয়, কারণ এই দীক্ষা দীপ্ততম মন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা অতীত, অনাগত এবং আরব্ধ এই তিন প্রকার পাশের নাশকারিণী। এই দীক্ষানিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধি হয় ও দেহান্তে পরম পদ লাভ হয়। গহ্বরতন্ত্রে আছে—

দৃষ্টনা শিষ্যং জরাগ্রস্তং ব্যাধিনা পরিপীড়িতম্।
উৎক্রময্য ততস্ত্বেনং পরতত্ত্বে নিয়োজয়েৎ॥

সবীজ দীক্ষা বিদ্বান্ ও কষ্টসহিষ্ণু শিষ্যগণের জন্য। যাঁহারা এই দীক্ষা লাভ

করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়াচার ভাল করিয়া পালন করিতে হয়। না করিলে শিবময়ী স্বসত্তা হইতে কিছু সময়ের জন্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপন্ন হইতে হয়।

১২

পুত্রক ও আচার্যদীক্ষা সবীজ। বাগীশ্বরীর গর্ভ হইতে জন্মবশতঃ পুত্রক নামের সার্থকতা। পৃথিবী হইতে কলাতত্ত্ব পর্যন্ত মায়ার অন্তর্গত। ইহাই সংসারমণ্ডল। ইহার পর শুদ্ধবিদ্যার রাজ্য। শুদ্ধবিদ্যাই বাগীশ্বরী। এই বাগীশ্বরীর গর্ভে জন্ম হইলেই শুদ্ধ ধামে অবস্থান ও সঞ্চারের অধিকার জন্মে। এই জন্ম যে প্রাকৃত জন্ম নহে তাহা বলা অনাবশ্যক। ইহাই বস্তুতঃ **দ্বিতীয় জন্ম**। গুরু বা আচার্যই এই জন্মের দাতা পিতা। এই জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে মায়ারাজ্য অতিক্রম করিবার উপায় অধিগত হয়। দ্বিতীয় জন্ম বস্তুতঃ **বৈন্দব-দেহ** বা **মন্ত্রদেহ** লাভেরই নামান্তর। কিপ্রকারে এই জন্ম লাভ হয় তাহার বর্ণনা স্বচ্ছন্দাদি আগমে আছে। তদনুসারে একুশটি অবান্তর সংস্কারের দ্বারা এই জন্মব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। ইহার পর **ভোগ, অধিকার** ও **লয়** এই তিনটি সংস্কার আছে। সকলের শেষে যে সংস্কারটি আছে, তাহার নাম নিষ্কৃতি। এইভাবে দ্বিতীয় জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পর্যন্ত পাঁচটি ব্যাপার পর পর যথাবিধি সম্পন্ন হইলে জীব নিখিল পাশ ও পাশসংস্কার হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

ইহা ছাড়া আর একটি ব্যাপার আছে, তাহার নাম **শিবত্বযোজন**। তাহার জন্য তেরটি প্রমেয়ের অনুভবাত্মক জ্ঞান আবশ্যক। সদ্‌গুরুর দীক্ষাপ্রদানে পাশক্ষপণ ও শিবত্বের অভিব্যঞ্জন—এই উভয় ক্রিয়াই পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়। যে তেরটি বিষয়ের কথা বলা হইল তাহা এই :

(১) চার প্রমাণ, (২) প্রাণসঞ্চার, (৩) ষড়ধ্ববিভাগ, (৪+৫) হংসোচ্চার ও বর্ণোচ্চার, (৬) বর্ণকর্তৃক কারণত্যাগ, (৭) শূন্য, (৮) সামরস্য, (৯) ত্যাগ, সংযোগ ও উদ্ভব, (১০) পদার্থভেদন, (১১) আত্মব্যাপ্তি, (১২) বিদ্যাব্যাপ্তি (১৩) ও শিবব্যাপ্তি।

যোজনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে পুর্যষ্টক বা সূক্ষ্মদেহে যে অহংবোধ আছে, তাহার নিবৃত্তি আবশ্যক। পুর্যষ্টকের আশ্রয় প্রাণ এবং শূন্য অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় প্রাণ ও সুষুপ্তি অবস্থায় শূন্য। সুতরাং **প্রাণপদ** এবং **শূন্যপদ** উভয়কেই **প্রশান্ত** করিতে হইবে। এইজন্য শ্বাসের দেশগত ও কালগত পরিমাণ জানা আবশ্যক। প্রাণের আরোহ ও অবরোহ-রূপ সঞ্চার জানিয়া লঙ্ঘনীয় সমস্ত অধ্বার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। ঊর্ধ্বনদনাত্মক হংসোচ্চারের জ্ঞান ব্যতিরেকে অধ্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে না। হংসোচ্চার স্বাভাবিক ও প্রযত্নসাধ্য—এই দুইপ্রকার। প্রযত্নসাধ্য হংসোচ্চারে ক্রমশঃ মন্ত্রাবয়ব বর্ণসকল আপন আপন কারণস্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবতাকে এবং তদনুরূপ কালমাত্রাকে কিপ্রকারে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা জানা আবশ্যক। এতটা জানা না থাকিলে স্বপ্নাশ্রয় প্রাণপদকে শান্ত করা যায় না। ইহার পর

সুষুপ্তির আশ্রয় শূন্যপদেরও উপশম আবশ্যক। সুতরাং শূন্যপদের জ্ঞানও নিতান্তই অপেক্ষিত। পরমেশ্বরের সহিত আত্মার যোজনা সম্পন্ন হইবার পূর্বে মন্ত্র, আত্মা, নাড়ী প্রভৃতির সামরস্য-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, কিন্তু পূর্বে সাম্যজ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে সামরস্য-জ্ঞান লাভ করা যায় না। অতএব সাম্যজ্ঞানও চাই। তন্ত্রশাস্ত্রে সাম্যকে বিষুবৎ নামে বর্ণনা করা হয়। মন্ত্রোচ্চারের অঙ্গ-রূপে অকারাদি উন্মনান্ত দ্বাদশটি জ্ঞেয়ের জ্ঞান আবশ্যক। দ্বাদশটি জ্ঞেয় এইপ্রকার—অ, উ, ম, বিন্দু, অর্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। ত্যাগ করিবার জন্যই এই সকলের জ্ঞান আবশ্যক হয়, কিন্তু ত্যাগ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন হইতে পারে না যতক্ষণ তত্তদ্ দশার সহিত সংযোগ না ঘটে। তত্তদ্ দশার ত্যাগে ক্রমিক ঊর্ধ্বারোহ-রূপ উদ্ভবের জ্ঞানও থাকা আবশ্যক। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রন্থিসকলের ভেদ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগের দ্বারাও ঊর্ধ্ব উদ্ভব সম্ভবপর হয় না। এই গ্রন্থিভেদের উপায় জ্ঞান ও যোগ। জ্ঞান ও যোগ-রূপ দুইটি শূলের দ্বারা গ্রন্থিভেদ করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান ও যোগের মূল ভাবের দৃঢ়তা।

এই পরিমাণ জ্ঞানের ফলে প্রাণ ও শূন্য উভয়পদের প্রশান্তি ঘটে। ইহার পর আত্মা, বিদ্যা ও শিব—এই তিন তত্ত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক হয়। শুদ্ধ আত্মদশার অনুভব পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের ব্যাপ্তি। এই ত্রয়োদশ প্রকার প্রমেয়ের জ্ঞান আগম হইতে ও অনুভব দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। ইহা না হইলে পরতত্ত্বে যোজন হইতেই পারে না।

অখিল পাশকে নাশ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরভাবের বিকাশ—ইহাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। অদ্বৈতমতে এই পরমেশ্বরভাব শিবত্ব, দ্বৈতমতে শিবসাম্য—ইহাই মাত্র ভেদ।

১৩

এখন প্রসঙ্গতঃ বামকেশ্বর তন্ত্রানুসারে শাক্তসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে।

এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সৃষ্টির যেটি প্রথম দশা সেটি তত্ত্বাতীত অবস্থা হইতে তত্ত্বপ্রধান দ্বৈতভাবের আবির্ভাব। তত্ত্বাতীত অবস্থায় প্রকাশ-রূপ শিব ও বিমর্শ-রূপা শক্তি—এই উভয়ের সামরস্য থাকে। বিশ্ব তখন থাকে না অর্থাৎ শক্তিগর্ভে অন্তঃসংহৃতভাবে শক্তির সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। কিন্তু যখন পরা-শক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ নিজের স্ফুরত্তা দর্শন করেন তখনই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। সতত এই স্ফুরত্তাদর্শনই বিশ্বদর্শন এবং বিশ্বদর্শনই বিশ্বসৃষ্টি। এই অবস্থায় দৃষ্টিই সৃষ্টি।

অনুত্তর-দশাতে বিশ্ব স্বরূপের সহিত অভিন্নভাবে থাকিলেও তাহার দর্শন হয় না। তাই ইহা সৃষ্টির অতীত অবস্থা। ঐ শক্ত্যাত্মক প্রলীন বিশ্ব যখন ভিন্ন না হইয়াও ভিন্নবৎ অবভাসমান হয় তখনই সৃষ্টির সূচনা হয় বুঝিতে হইবে।

অনুত্তরের অঙ্গীভূত পরা-শক্তিই বিশ্বদর্শন বা সৃষ্টি করেন, শিব তটস্থ থাকেন। ঐ যে সামরস্য-অবস্থার কথা বলা হইল উহা শিব ও শক্তির পরস্পর অভিন্নভাব। শিব অগ্নি বা সংবর্তানল, শক্তি সোম বা বিবর্তচন্দ্র—উভয়ের সাম্যই চরম অবস্থাতে শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে বিন্দুপদবাচ্য। এই বিন্দুই কাম বা রতি। বিন্দুক্ষোভ বা সাম্যের চ্যুতি হইতেই সৃষ্টির প্রারম্ভ হয়। সাম্যাবস্থায় অগ্নি ও চন্দ্ররূপী শুক্ল ও রক্তবিন্দু অহং-রূপে অভিন্ন থাকে। ক্ষোভ হইতে চিৎকলার আবির্ভাব হয়।

অগ্নির তাপে যেমন ঘৃতের দ্রুতি ও ধারাপাত আরম্ভ হয় তদ্রূপ প্রকাশাত্মক অগ্নির সম্বন্ধবশতঃ বিমর্শশক্তির স্রাব হয়। এইভাবে শ্বেত ও রক্তবিন্দুদ্বয়ের অন্তরাল হইতে হার্ধকলার নিঃসরণ হয়। চৈতন্যের অভিব্যক্তির ইহাই রহস্য। শুধু চৈতন্য নহে, আনন্দশক্তির বিকাশেরও ইহাই রহস্য।

এইভাবে সমগ্র বৈন্দবচক্রটি চিৎকলাময়-রূপেই আবির্ভূত হয়। বলা বাহুল্য, এই চক্রটি পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই তিন মাতৃকা দ্বারা কল্পিত। এই মূল-স্থান হইতেই ছত্রিশটি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

১৪

প্রকাশ এবং বিমর্শ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। বিমর্শ বা পরা-শক্তির স্ফুরত্তার রহস্য শাক্ত ও শৈবতন্ত্রে বহুস্থানে উল্লিখিত এবং প্রসঙ্গতঃ অল্পাধিক আলোচিত হইয়াছে। ঐ বিষয়ে সম্যক্ বিচার সম্ভবপর না হইলেও দিগ্‌দর্শন-রূপে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে।

সৃষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের মূলে প্রকাশ ও বিমর্শ আছে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষবশতঃ পরা-শক্তি অন্তর্লীন অবস্থা হইতে যখন অভিব্যক্তি বা পরিস্ফুটতা লাভ করে, তখনই বিশ্বচক্রের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ অভিব্যক্তি, শক্তি বা বিমর্শেরই হয়, প্রকাশে তাহার উপচারমাত্র হয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তত্ত্বমাত্রই শক্তিরই স্বাতন্ত্র্যোল্লাস-নিমিত্তক অবস্থাবিশেষ। তাই শিবতত্ত্বও শক্তি-মধ্যেই পরিগণিত হয়। একজন সিদ্ধ শাক্তাচার্য বলিয়াছেন—

> তথা তথা দৃশ্যমানানাং শক্তিসহস্রাণামেকসংঘট্টঃ।
> নিজহৃদয়োদ্যমরূপো ভবতি শিবো নাম পরমস্বচ্ছন্দঃ॥

সুতরাং প্রকাশ ও বিমর্শ এক দৃষ্টিতে পরবিমর্শেরই প্রকারভেদ মাত্র। শুদ্ধ প্রকাশ যাহা তাহা অনুত্তর, বিশ্বোত্তীর্ণ ও তত্ত্বাতীত। বিমর্শ সেখানে অন্তর্লীন, সুতরাং তত্ত্ব-

বিচারে প্রকাশ এবং বিমর্শ উভয়ই বিমর্শাত্মক বা শক্ত্যাত্মক বলিয়া উভয়ত্রই অংশকল্পনা করা হয়।

বামকেশ্বর মতে প্রকাশের অংশ চারিটি এবং উহার সহিত অবিনাভূত বিমর্শেরও অংশ চারিটি। প্রকাশাংশসমূহের নাম—অম্বিকা, বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, বিমর্শাংশসকলের নাম—শান্তা, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। অম্বিকা ও শান্তা সামরস্য-অবস্থাতে শান্তাভাবাপন্না পরা-শক্তি, পরা-বাক্ নামে পরিচিতা হয়। ইহা আত্মস্ফুরণের অবস্থা—

আত্মনঃ স্ফুরণং পশ্যেৎ যদা সা পরমা কলা।
অম্বিকারূপমাপন্না পরা বাক্ সমুদীরিতা॥

এই যে আত্মস্ফুরণের কথা বলা হইল, এই অবস্থায় সমগ্র বিশ্ব বীজরূপে বা অস্ফুটরূপে আত্মসত্তায় বর্তমান থাকে। ইহার পর শান্তা হইতে ইচ্ছার উদয়ে ঐ অব্যক্ত বিশ্ব শক্তিগর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। ইচ্ছা তখন বামার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং পশ্যন্তী বাক্ নামে পরিচিত হয়। ইহার পর জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়। জ্ঞানশক্তি জ্যেষ্ঠার সহিত অভিন্ন ও মধ্যমা বাক্ নামে খ্যাত। এই শক্তি পূর্ব উপায়ে সৃষ্ট বিশ্বের স্থিতির কারণ। জ্ঞানানন্তর ক্রিয়াশক্তি রৌদ্রীর সহিত একত্ব লাভ করিয়া বৈখরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রপঞ্চাত্মক বাগ্‌বৈচিত্র্য সবই বৈখরীর রূপ।

এই যে চারি প্রকার বাকের কথা বলা হইল ইহাদের দ্বারাই মূল ত্রিকোণ বা মহাযোনির স্ফুরণ হয়। শান্তা ও অম্বিকার সামরস্য বা পরা-মাতৃকা এই ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু। ইহা স্পন্দময়। পশ্যন্তী ইহার বাম রেখা, বৈখরী দক্ষিণ রেখা এবং মধ্যমা সরল অগ্ররেখা। মধ্যস্থ মহাবিন্দুই অভিন্ন-বিগ্রহ শিবশক্তির আসন। এই ত্রিকোণমণ্ডল চিৎকলার আভায় উজ্জ্বল। ইহার বাহিরে ক্রমবিন্যস্তভাবে শান্ত্যতীত, শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিকলার আভাময় স্তর সকল অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল স্তরের সমষ্টিই বিশ্ব নামে পরিচিত। সুতরাং ভূপুর হইতে মহাবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র বিশ্বচক্রই সেই মহাশক্তির বিকাশ। মধ্য ত্রিকোণবিন্দু-বিসর্গময়, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহার প্রতিরেখাই পঞ্চস্বরময়। অ হইতে অং পর্যন্ত পঞ্চদশ-স্বরাত্মক এই ত্রিকোণমণ্ডলের বিন্দুস্থান বিসর্গকলা (অঃ) দ্বারা আক্রান্ত। এই ত্রিকোণের স্পন্দন দ্বারা অষ্টকোণ কল্পিত হয়। অষ্টকোণ রৌদ্রী শক্তির রূপ। ইহা শান্ত্যতীত কলার প্রভায় উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি স্তরই প্রকাশ ও বিমর্শময়—অর্থ ও শব্দময়। তত্তদ্ বর্ণ (বাচক) ও তত্তৎ তত্ত্বের (বাচ্য) তাদাত্ম্য তত্তৎ চক্রাংশে অনুভূত হয়। সমগ্র চক্রটিতে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালা এবং শিবাদি পৃথিব্যন্ত তত্ত্বনিচয় অভিব্যক্ত হয়। সাধক যখন কুণ্ডলিনীর সুপ্তিভঙ্গের পর ঊর্ধ্বে উত্থান করিতে অথবা ইষ্ট-দেবতার স্বরূপাত্মক চক্র-মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে তখন বস্তুতঃ এই বিশ্বচক্রেই প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতে থাকে। অকুল হইতে মহাবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত মহাপথের মধ্যে যে-সকল অবান্তর-চক্র আছে, তাহাদের সমষ্টিই বিশ্বচক্র। ইহার মধ্যে অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত অংশ স-কল, আজ্ঞাচক্রের উপরে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত অংশ সকল-নিষ্কল, এবং উন্মনার পর মহাবিন্দু অংশ নিষ্কল। বস্তুতঃ এই মহাবিন্দুই বিশ্বের হৃদয়। ইহাই বিশ্বাতীত পরমেশ্বরের বা শিবশক্তির আবির্ভাব-স্থান বা আসন।

মহাবিন্দুই বস্তুতঃ শবরূপী সদাশিব, যাহার উপর চিৎ-কলা বা চিৎ-শক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ীরূপে খেলা করেন। এই খেলা পরা-বাক্‌ বা পরা-মাতৃকার বিলাস। শুক্ল ও রক্তবিন্দুরূপ প্রকাশ ও বিমর্শাত্মক কামকলাক্ষরের পরস্পর সংঘট্ট হইতে চিৎ-কলার অভিব্যক্তি হয়। মহাবিন্দুর স্পন্দনবশতঃ বিলীন বিন্দুত্রয় বিশ্লিষ্ট হইয়া রেখারূপে ধারণপূর্বক মহাত্রিকোণরূপে পরিণত হয়, যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখান হইতে শিব প্রভৃতি ছত্রিশ তত্ত্বময় বিশ্বের স্ফুরণ হয়।

এই মহাত্রিকোণের চারিটি পীঠ আছে। প্রতি পীঠেই বিশ্বের রূপ ভাসমান হয়—স্বরূপে বীজভাবে হয় এবং বাহ্যে সৃষ্টিরূপে হয়। পীঠ বলিতে প্রকাশমাত্রা ও বিমর্শমাত্রার সামরস্য বুঝিতে হইবে। যেমন কামরূপ পীঠ—ইহা অম্বিকা ও শান্তা শক্তির সামরস্য। ইহা পীত চতুরস্র-রূপে আধারস্থানে বিরাজমান। ইহারই নামান্তর মন। ইহাতে বিন্দুচৈতন্যের যে প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বলে। বস্তুতঃ এই পীঠ মহাত্রিকোণের অগ্রকোণ-স্বরূপ। এই প্রকারে ত্রিকোণের অন্য দুই কোণ যথাক্রমে পূর্ণগিরি ও জালন্ধর পীঠ নামে প্রসিদ্ধ এবং সেখানকার প্রতিফলিত চৈতন্য ইতরলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ নামে পরিচিত। এই দুইটি বুদ্ধি ও অহংকারের নামান্তর এবং দেহে ইহাদের স্থান হৃদয় ও ভ্রূমধ্য। মধ্য-বিন্দু উড্ডীয়ান বা শ্রীপীঠ অর্থাৎ চিত্তস্বরূপ। ঐখানে যে জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয় তাহারই নাম পরলিঙ্গ। প্রত্যেকটি লিঙ্গ নির্দিষ্টসংখ্যক বর্ণের দ্বারা আবৃত, কিন্তু পরলিঙ্গ সর্ব-বর্ণাবৃত। এই পরম লিঙ্গই পরমপদ হইতে প্রথম স্পন্দরূপে উদিত হয়।

১৫

তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে শিবশক্তি-যামলের অহংপরামর্শ পূর্ণ ও স্বাভাবিক। ইহাই পূর্ণাহন্তা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা নির্বিকল্পকজ্ঞান-স্বরূপ, বিকল্পাত্মক নহে। স্বাতন্ত্র্যবশতঃ ইহাতে বিভাগ আভাসমান হয়। ঐ পরাহন্তা বা পরা-বাক্‌ বিভক্ত দশায় পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই তিনরূপ ধারণ করে। ইহার প্রত্যেকটিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরভেদে তিনটি ভেদ আছে। পরম তত্ত্ব নিরংশ প্রকাশ-স্বরূপ হইলেও তাহার মুখ্য তিন শক্তির ভেদবশতঃ এই বিভাগ উপপন্ন হয়। শক্তি তিনটি এই—পরা বা অনুত্তরা বা চিৎ-শক্তি, পরাপরা বা ইচ্ছাশক্তি, অপরা বা উন্মেষ-রূপা জ্ঞানশক্তি। এই তিনটি মিলিত হইয়া পরমেশ্বরের পূর্ণশক্তি (পরং মহঃ) নামে আগমে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অনুত্তর বা চিৎ-শক্তি 'অ', ইচ্ছাশক্তি 'ই' ও উন্মেষ বা জ্ঞানশক্তি 'উ'। এই শক্তিত্রয়ই 'অইউ' নামক ত্রিকোণ। ইহাদের ক্ষুব্ধ রূপ লইয়া ছয়টি শক্তি হয়—'অ'য়ের ক্ষোভ হইতে আ, 'ই'য়ের ক্ষোভ হইতে দীর্ঘ ঈ এবং 'উ'য়ের ক্ষোভ হইতে দীর্ঘ ঊ হয়। 'আ'—আনন্দ, ঈ—ঈশান, ঊ—ঊনতা বা ঊর্মি জানিতে হইবে। আনন্দাদি শক্তিনিচয় ক্ষুব্ধ হইলেও স্বীয় স্বরূপ হইতে অচ্যুত থাকে বলিয়া মলিন হয় না। সেইজন্য এইগুলিও পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা শক্ত্যন্তর প্রকট করিতে সমর্থ হয়। এই ছয়টি স্বরই বর্ণসন্ততির মূল। ইহারা ষড়্‌দেবতা এবং সূর্যের মুখ্য ষড়্‌রশ্মি নামে প্রসিদ্ধ। এই ছয়টি শক্তির পরস্পর সংঘট্টই ক্রিয়াশক্তি, যাহা হইতে দ্বাদশটি শক্তির বিকাশ হয় (ঋ, ঋ,

৯, ৯ৃ—এই চারিটি ক্লীবস্বর রূপে বর্ণিত হয়)। যাবতীয় শক্তি এই বারটি শক্তিরই অন্তর্গত। ইহারাই মুখ্য শক্তিচক্র। ইহাদের সঙ্গে সমন্বিত শিবকেই পূর্ণশক্তি বলা হয়। কৌলগণের মধ্যে অনেকে এই বারটি শক্তিকে দ্বাদশকালিকারূপে বর্ণনা করেন। শ্রীসার-শাস্ত্রে ইহাদের নাম রাখা হইয়াছে দ্বাদশ যোগিনী।

এই সকল শক্তি প্রক্ষীণমল, শুদ্ধ ও উদ্রিক্তচৈতন্য—ইহাদের দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির কোনো আবরণ নাই। চতুঃষষ্টিযোগিনী বা শক্তিচক্র এই মুখ্য বারটি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই বারটি শক্তির সমষ্টির নাম অঘোরশক্তি। ঘোরা ও ঘোরতরা শক্তি ইহা হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহা হইতে অভিন্ন।

সৃষ্ট্যাদিক্রমে এই বারটি শক্তির পৃথক্ পৃথক্ রূপ আছে। অনাখ্যা-ক্রমেও পৃথক্ পৃথক্ রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। যে ক্রমে সৃষ্ট্যাদি উপাধি নাই তাহাকেই অনাখ্যা বলে অর্থাৎ নিরুপাধিক স্বরূপ সৃষ্টিতেও এই বিভাগ আছে, ইহাই তাৎপর্য।

এই যে স্বরূপগত উপাধিহীনতার কথা বলা হইল ইহা দুইপ্রকারে সম্ভবপর হয়—(ক) উপাধিসকলের অনুল্লাসবশতঃ অথবা (খ) উপাধিসকলের উপশমবশতঃ। উপাধির পাকবশতঃই উপশম ঘটে। তান্ত্রিকগণ মধুরপাক ও হঠপাক নামক দুইপ্রকার পাক স্বীকার করেন। যাহারা গুরু দেবতাদির আরাধনা করিয়া সময়ী প্রভৃতি দীক্ষা সম্পাদনপূর্বক নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মে নিষ্ঠাবান্ থাকেন তাঁহারা দেহান্তে সৃষ্ট্যাদি উপাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। সৃষ্টি প্রভৃতি উপাধির উপশম স্বাভাবিক নহে, শাস্ত্রোপদেশাদি উপায়-সাপেক্ষ। এই উপায় ধীরে ধীরে দেহান্তে উপাধিনাশে সমর্থ হয়। পরমেশ্বরের শক্তিসঞ্চার তীব্র না হইয়া মন্দমাত্রায় হইলে এইপ্রকার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের উপর ভগবৎকৃপা তীব্রমাত্রায় সঞ্চারিত হয় তাহারা একবার মাত্র উপদেশপ্রাপ্ত হইয়াই মুক্তিলাভ করেন। এই ক্রমে সৃষ্ট্যাদি উপাধিত্রয় পূর্ণরূপে চিদগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায় অর্থাৎ অচিৎ-ভাব পরিহার করিয়া আত্মশক্তির স্ফুরণ-রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনের পর এই পাক-ক্রমে সৃষ্ট্যাদি পদার্থগত ভেদ বিগলিত হয়। তখন বিশ্ব অমৃতসাৎ হয় অর্থাৎ বোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। এই অমৃতরূপ বিশ্বকে পূর্ববর্ণিত শক্তিচক্র অর্থাৎ 'অ' প্রভৃতি বারটি সংবিত্তি-দেবী বা করণেশ্বরী ভোগ করেন অর্থাৎ পরবোধের সহিত অভেদে পরামর্শন করেন। কারণ ঐ সকল শক্তি অঘোরা-শক্তির প্রকাশ। এই ভোগের দ্বারাই ঐ সকল শক্তি বা দেবী তৃপ্ত হন। তখন তাঁহাদের অন্যের প্রতি অপেক্ষাভাব আর থাকে না। ইহার ফলে, হৃদয়স্থ পরমপ্রকাশাত্মক স্বরূপভূত পরমতত্ত্বের সহিত অভেদে স্ফুরণ হয়। এই সকল শক্তি পরমেশ্বর-স্বরূপে বিশ্রান্ত বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। তথাপি এই অভেদসত্ত্বেও কৃত্য, ক্রিয়াবেশ, নাম ও উপাসনার ভেদবশতঃ ইঁহারা ভিন্নভাবে আভাসমান হন। এই সকল শক্তির সংকোচ ও বিকাশ উভয়ই আছে। এইজন্য ইঁহারা সংখ্যায় বারটি হইলেও একদিকে যেমন সব মিলিয়া একাকার হইতে পারেন, অপরদিকে তেমনি কোটি কোটিও হইতে পারেন।

সম্প্রদায়

১

প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক তান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। ইহার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই যে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে সর্বরূপে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহা বলা যায় না। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সাধনা ও তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি উপলব্ধ হয়। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নামমাত্র উপলব্ধ হয়। তাহাদের সাধনার অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর বিবরণ কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তান্ত্রিক সাহিত্যের ইতিহাস সংকলিত হইলে সম্ভবতঃ এই ন্যূনতা কিয়দংশে দূর হইবে, ইহা আশা করা যায়।

এই সকল সম্প্রদায় সকলেই যে কোনো-না-কোনো-প্রকার শক্তিবাদী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই শক্তিবাদ সকলের ঠিক একপ্রকার নহে। কারণ শৈব, পাশুপত প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদে শক্তির স্বরূপ এবং শিবের সহিত ইহার সম্বন্ধ বিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় সাধারণতঃ শৈব সম্প্রদায় অথবা মাহেশ্বর সম্প্রদায় অথবা তান্ত্রিক সম্প্রদায়—এই জাতীয় কোনো নামে প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সকল সম্প্রদায়ের কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল—

১। কুলমার্গ বা কৌল মত
২। পাশুপত মত
৩। লাকুল মত
৪। কাপালিক মত
৫। সৌম মত
৬। মহাব্রত মত
৭। জঙ্গম মত
৮। কারুণিক বা কারুক মত
৯। কালানল মত
১০। কালামুখ মত
১১। ভৈরব মত
১২। বাম মত
১৩। ভট্ট মত
১৪। নন্দিকেশ্বর মত
১৫। রসেশ্বর মত
১৬। সিদ্ধান্ত মত (শৈব)
১৭। সিদ্ধান্ত মত (রৌদ্র)

তন্ত্রের অবতরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে দুর্বাসা হইতে আগমের প্রচারপ্রসঙ্গে অদ্বৈতাদি ত্রিবিধ মার্গের পুনঃপ্রবর্তন হইয়াছিল। এই তিনটি মার্গের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটি মঠ প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত একটি চতুর্থ মঠেরও সন্ধান পাওয়া যায়; তাহা কামরূপ পীঠের সহিত সম্পৃক্ত। ইহাকে 'তুরীয় সন্ততি' নামে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নির্দেশ করা হয়। এইজন্য মচ্ছন্দ্র অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথকে 'তুরীয়নাথ' নামে অভিহিত করা হয়। এই মার্গটি কুলমার্গ, কৌলমার্গ, অতিমার্গ, কালীনয়, অর্ধ-ত্র্যম্বক মার্গ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক সাহিত্যের বিবরণ দিবার পূর্বে এই সুপ্রসিদ্ধ কুলাচার বা কৌল মার্গ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

সাধারণতঃ যে গুরুপরম্পরার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে মার্গপ্রবর্তকরূপে আদিগুরু ভৈরব বা স্বচ্ছন্দভৈরবের (শিবেরই নামান্তর) নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা কুলমার্গ-রূপে যে ধারার নির্দেশ করিতেছি তাহা পূর্বোক্ত ধারা হইতে ভিন্ন; কারণ, এই ধারাতে আদিগুরু-রূপে ভৈরবীকে ধরা হইয়াছে, ভৈরবকে নহে। ভৈরবীপ্রবর্তিত এই সন্তান কৌলসম্প্রদায় নামে পরবর্তী কালে খ্যাত হইয়াছে।

ভৈরবী হইতে মহাজ্ঞান অবতীর্ণ হইয়া ভৈরব অথবা স্বচ্ছন্দে স্থিত হয়। তাহার পর অবরোহক্রমে মৎস্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত নামিয়া আসে। এই মৎস্যেন্দ্র মীনসিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কামরূপ পীঠের অধীশ্বর ছিলেন ও তুর্যনাথ নামে তান্ত্রিক মণ্ডলে পরিচিত ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্যপরম্পরাতে দীর্ঘকাল পরে সুমতিনাথ নামে দক্ষিণ পীঠের একজন সিদ্ধপুরুষ গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুমতিনাথের শিষ্য সোমদেব, যিনি কুলমার্গের বা অতিমার্গের উপদেষ্টা ছিলেন। সোমদেবের শিষ্য ছিলেন শম্ভুনাথ। ইনি জালন্ধর পীঠ হইতে খ্যাতি লাভ করেন। কোনো কোনো স্থানে তাঁহাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে সুমতির শিষ্যও বলা হইয়াছে (জয়রথ-তন্ত্রালোকটীকা, ১।২৪৩)।

শম্ভুনাথের শিষ্য জগৎপ্রসিদ্ধ মহামাহেশ্বরাচার্য অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্তের কৌলগুরু শম্ভুনাথ ছিলেন, যাঁহার মত সম্বন্ধে তিনি স্বীয় গ্রন্থে বহুস্থানে অসীম শ্রদ্ধাসহকারে বহু কথা বলিয়াছেন। শম্ভুনাথের দূতী ছিলেন ভগবতী নাম্নী কোনো সিদ্ধা রমণী। অভিনবগুপ্ত দূতীসহ স্বীয় কৌলগুরুকে 'তন্ত্রালোকে' নমস্কার করিয়াছেন (তন্ত্রালোক, ১।৩১)। প্রত্যভিজ্ঞা ও ক্রমবিজ্ঞানের গুরু ছিলেন লক্ষ্মণগুপ্ত (তন্ত্রালোকটীকা, ১।২১৩)। শম্ভুনাথ অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। অভিনবগুপ্ত শম্ভুনাথকে 'জগদুদ্ধরণক্ষম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় অভিনবগুপ্ত নিজ গুরুকে কী দৃষ্টিতে দেখিতেন।

কৌল মার্গ সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে এবং সাধারণ জনতার মধ্যেও দুইটি মত প্রচলিত আছে। একমতে কৌল সাধনাই অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অপর মতে ইহা অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কুলার্ণবতন্ত্রে দ্বিতীয় উল্লাসে সাতপ্রকার আচারের মধ্যে কৌলাচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এই মতে বেদাচার হইতে আরম্ভ করিয়া কৌলাচারে অধ্যাত্মসাধনার চরম উৎকর্ষ সূচিত হয়—'কৌলাৎ পরতরং নহি'। বিশ্বসার তন্ত্রের চতুর্বিংশ পটলেও এই কথাই পাওয়া যায়। তদনুসারে সাতটি আচার তিনটি ভাবের অন্তর্গত। তন্মধ্যে পশুভাবই প্রথম ভাব। বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ—এই চারিটি আচার এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল—এই তিনটি আচার বীর ও দিব্যভাবে সংস্থিত। বিশ্বসার তন্ত্রে আছে যে কুলধর্মসাধনে দিক্‌কালের নিয়ম নাই, বিধিনিষেধের মূল্য নাই, অন্য কোনোপ্রকার নিয়ন্ত্রণও নাই। ইহাতে আরও আছে—

কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো নহি॥

কর্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়েঽপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে (?)
ন ভেদো যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ॥

চিন্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্বত্র সমদৃষ্টিমান্।
দয়াধৃতিক্ষমাযুক্তঃ স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥

যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।
সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন সঃ কৌলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥

জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ।
আরুরুক্ষুর্জ্ঞানভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতো মতঃ॥

করিপদে নিমজ্জন্তি সর্বে প্রাণিপদা যথা।
কুলধর্মে নিমজ্জন্তি সর্বে ধর্মাস্তথা প্রিয়ে॥

প্রসঙ্গতঃ জানা আবশ্যক পশুভাব ভেদভাব, বীরভাব ভেদাভেদভাব এবং দিব্যভাব অভেদভাব। কৌলধারার মধ্যে অবান্তর বিভাগ আছে। তান্ত্রিক সাধনাতে সকলেই কৌল-ধর্মী নহে। তান্ত্রিক সম্প্রদায়েও কেহ কেহ কৌল, কেহ কেহ কৌলবিরোধী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কৌল সাহিত্যে যে পূর্ণ সাধনার চিত্র আছে, বিরুদ্ধবাদীদের রচনা হইতে ঠিক্ সে-চিত্র পাওয়া যায় না।

কৌলসাধনার উপজীব্য বহু গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির নাম এইস্থানে প্রদত্ত হইল—

কুলার্ণব, কুলচূড়ামণি, রুদ্রযামল, ভাবচূড়ামণি, দেবীযামল, কুলপঞ্চামৃত, উত্তরতন্ত্র, কুলতন্ত্র, কুলামৃত, তন্ত্রচূড়ামণি, কুলযামল, কুলগহ্বর, কুলদীপনী, কুলপঞ্চাশিকা, কুলপ্রকাশ, কুলমত, কুলমূলাবতার, কুলমন্ত্র-মাতৃকাসাহস্রিক, কুলরত্নমালা, কুলরত্নমালিকাসাহস্রিকা, কুল-প্রদীপ, কুলার্ণবমহারহস্য, মেরুতন্ত্র, (ইহাতে বাম ও দক্ষিণ উভয় মার্গের উপদেশ আছে), কুলরত্নাবলী, কুলশাসন, কুলসংগ্রহ, কুলসর্বস্ব, কুলসার, কুলাগম, কুলানন্দসংহিতা, কুলাম্নায়, কুলালিকাম্নায়তন্ত্র, কুলাবতার, কুলেশ্বর, কুলোড্ডীশ, কুলোত্তম, কৌলতন্ত্র, কৌলমার্গ, কৌলরহস্য, রজস্বলাতত্ত্ব, কৌলিকার্চনদীপিকা, কৌলালবীয়, কৌলাদর্শতন্ত্র, রহস্যার্ণব, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শাম্ভবীতন্ত্র, দক্ষিণামূর্তিসংহিতা, পরমানন্দতন্ত্র, গন্ধর্বতন্ত্র, বামকেশ্বর তন্ত্ররাজ, কৌলোপনিষৎ, ত্রিপুরা মহোপনিষৎ, সুন্দরীতাপনী, গুহ্যোপনিষৎ, আগমসার, পরশুরাম কল্পসূত্র ইত্যাদি।

কুলপ্রদীপে আছে যে যে-সব গ্রন্থে সদাশিব কুলমার্গের বর্ণনা করিয়াছেন কলিযুগে তাহা পাওয়া যায় না, তাই তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানও দুর্লভ। আরও বলা হইয়াছে—

গুরোঃ কৃপা যস্য ভবেৎ প্রভূতা
শ্রীদেবতায়াশ্চ মহান্ প্রসাদঃ।
তস্যৈব পুংসঃ কুলশাস্ত্রবোধ—
স্তস্যাত্র ভক্তির্ন খলাপনোদ্যা॥

যেষাং দৃঢ়া ভক্তিরিহাস্তি শাস্ত্রে
বিদন্তি সম্যক্ সকলং রহস্যম্।
প্রাগ্‌জন্মপুণ্যাদ্ বিমলা মনীষা
তে নিন্দকা নাস্য ভবন্তি লোকাঃ॥

ভিন্না পশুভ্যো নিজগোপনার্থং
নিন্দন্তি কেচিৎ কুলশাস্ত্রমেতৎ।
কেচিত্তু নিন্দানিরতা অবোধা
দৌষ্ট্যেন যে তে নিরয়ে নিবস্তুম্॥

২

কুলাচার কি? সেতুবন্ধকার বলেন যে পরশুরাম কল্পসূত্রে 'ব্যবহারদেশস্বাত্ম্যৎ' প্রভৃতি হইতে 'পরে তু শাস্ত্রানুশিষ্টাঃ' পর্যন্ত যে আচার বর্ণিত হইয়াছে তাহাই কুলাচার। পরশুরাম কুলসাধনার অতি প্রাচীন আচার্য।

কৌলজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে শৈব, বৈষ্ণব, দৌর্গ, আর্ক ও গাণপত্য প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে কৌলজ্ঞান জন্মে। শাস্ত্রে আছে—

পুরাকৃততপোদানযজ্ঞতীর্থজপব্রতৈঃ।
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্মিণো গুরুসেবিনঃ।
অতিগুপ্তস্য ভক্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে॥ (সেতুবন্ধ, পৃঃ ২৫)

কৌলদের বিষয়ে প্রসিদ্ধি আছে—

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥ (মন্ত্রমহোদধি)

কিন্তু কাশ্মীরীয় ত্রিকবাদিগণের দৃষ্টিতে ক্রমোৎকর্ষ—বেদাদি < শৈব < বাম < দক্ষিণ < কৌল < ত্রিক এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

বেদাদিভ্যঃ পরং শৈবং শৈবাদ্‌বামং তু দক্ষিণম্।
দক্ষিণাৎ পরতঃ কৌলং কৌলাৎ পরতরং ত্রিকম্॥
(বিজ্ঞানভৈরব ক্ষেমরাজ, পৃঃ ৪)

লক্ষ্মীধর সৌন্দর্যলহরীর টীকাতে বহুস্থানে কৌলদের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার

মতে কৌলমত অপ্রামাণিক ও অবৈদিক। ভট্টোজিদীক্ষিত তন্ত্রের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু অপ্পয্যদীক্ষিতও ত্রিপুরা মহোপনিষদের ব্যাখ্যাতে কৌলমার্গের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন।

শুভাগমপঞ্চকের অন্তর্গত সনৎকুমার সংহিতাতে যে ছয়টি বেদবাহ্য ও বাহ্যপূজারত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের নাম করা হইয়াছে তন্মধ্যে কৌল সম্প্রদায়ই প্রথম। বাকি পাঁচটির নাম এইপ্রকার—ক্ষপণক, কাপালিক, দিগম্বর, ইতিহাস ও বামক। ইহারা কেবল চক্রপূজক।

লক্ষ্মীধর কৌলমত সম্বন্ধে বলেন যে এই মতে বিন্দুর স্থান ত্রিকোণ অর্থাৎ আধারচক্র। ঐখানেই বিন্দুর আরাধনা কর্তব্য। কৌলগণ ত্রিকোণে নিত্য বিন্দুর অর্চনা করেন। এই ত্রিকোণ দুইপ্রকার। ইহা শ্রীচক্রের অন্তর্গত নবযোনির মধ্যবর্তী ত্রিকোণ হইতে পারে অথবা প্রত্যক্ষ স্থূল ত্রিকোণও হইতে পারে। পূর্ব কৌলগণ প্রথমটিকে ভূর্জ হেমপট্ট পীঠাদিতে অঙ্কিত করিয়া পূজাদি করেন, উত্তর কৌলগণ দুইটিরই পূজা করেন। তন্মধ্যে দুইটিই বাহ্য, আন্তর নহে। তাই কৌলদের আধারচক্রই এবং ঐ চক্রে স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিই পূজার বিষয়। কুণ্ডলিনীকেই কৌলিনী বলে। তিনিই ত্রিকোণ-পূজকদের মুখ্য উপাস্য।

এই কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দুরূপা। ইহাকে নিদ্রাবস্থাতেই পূজা করা হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবতঃ সর্বদাই নিদ্রামগ্ন থাকে। ইহার জাগরণক্ষণই কৌলদের পরিভাষাতে মোক্ষপদবাচ্য। এইজন্য কৌলদিগকে ক্ষণমুক্ত বলে। বামাচার প্রভৃতিতে পূজায় সুরা-মাংসাদির উপযোগ হয়। দিগম্বর, ক্ষপণক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আরাধনাক্রম ইহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন, কিন্তু ইহারই অনুরূপ।

৩

পূর্ব ও উত্তরভেদে কৌলমত দুইপ্রকার। লক্ষ্মীধর বলেন যে এই দুই মতের বিবরণ সৌন্দর্যলহরীর ৩৪ ও ৩৫ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত সময়মতের নিরূপণ করা হইয়াছে।

পূর্ব কৌলমতে ভগবতী আনন্দভৈরবী। ইনি ভগবান্ শিব বা আনন্দভৈরবের দেহস্বরূপ। সূর্য ও চন্দ্র এই দুইটি হইল তাঁহার স্তন এবং তাঁহার আত্মা হইলেন নবাত্মক শম্ভু। শম্ভু বা আনন্দভৈরব নবব্যূহাত্মক। শেষশেষিভাব উভয়ের মধ্যে সাধারণ, অর্থাৎ যখন শিব হন শেষী তখন শক্তি হন শেষ, আর যখন শক্তি হন শেষী তখন শিব হন শেষ। এই শেষশেষিভাবই সমরস পরানন্দ ও পরার সম্বন্ধ জানিতে হইবে।

পূর্বোল্লিখিত নয়টি ব্যূহ এইপ্রকার—

(১) কালব্যূহ—নিমেষাদি কলান্ত অবচ্ছিন্ন-কালের ধারাকে কালব্যূহ বলে। সূর্য ও চন্দ্র কালাবচ্ছেদক বলিয়া ইহারই অন্তর্গত।

(২) কুলব্যূহ—ইহা নীলাদি রূপ।

(৩) নামব্যূহ—ইহা সংজ্ঞাস্কন্ধেরই নামান্তর।

(৪) জ্ঞানব্যূহ—ইহাকে বিজ্ঞানস্কন্ধও বলে। ইহার অপর নাম ভাগব্যূহ। 'সভাগ' শব্দের অর্থ 'বিকল্প' এবং 'বিভাগ' শব্দের অর্থ 'নির্বিকল্প'।

(৫) চিত্তব্যূহ—অহংকার, চিত্ত, বুদ্ধি, মহৎ ও মন—এই অহংকার-পঞ্চস্কন্ধকে চিত্ত বলে।

(৬) নাদব্যূহ—রাগ, ইচ্ছা, কৃতি—প্রযত্নস্কন্ধ এই প্রসঙ্গে আলোচনীয়। মাতৃকার চারিটি রূপ নাদব্যূহের অন্তর্গত। তন্মধ্যে পরা-বাক্ তাহাকেই বলে যাহার রূপ অন্তঃকরণে উহ বা তর্কের সহিত স্ফুরিত হয়। যোগী শুধু যুক্তাবস্থায় ইহার পরিচয় লাভ করে। কামকলাবিদ্যাতে ইহাকেই পরা-মহেশ্বরী বলা হইয়াছে। ঐ পরা-বাক্ যখন অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে প্রতিভাসমান হয় তখন তাহার নাম হয় পশ্যন্তী। তখন ইহা ত্রিমাতৃকাত্মক হইয়া চক্ররূপ ধারণ করে—'স্পষ্টা পশ্যন্ত্যাদিত্রিমাতৃকাত্মা চক্রতাং যাতা'। ত্রিমাতৃকা বলিতে ত্রিখণ্ডযুক্তা পঞ্চদশাক্ষরী মাতৃকা বুঝিতে হইবে। ইহাই চক্ররূপে পরিণত হয়। এই পশ্যন্তী বাক্‌কে যুক্ত অবস্থাতে অতি সূক্ষ্মরূপে অনুভব করা যায়। পরা ও পশ্যন্তী এই দুইটি বাক্ হইতে মধ্যমা বাকের উদয় হয়। ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি ভেদ আছে। বামা, জ্যেষ্ঠী, রৌদ্রী ও অম্বিকা—এই চারিটি শক্তির যেটি সমষ্টি অবস্থা তাহাই সূক্ষ্মা মধ্যমা; ইহাদের যেটি ব্যষ্টি অবস্থা তাহাই স্থূলা মধ্যমা। বামাদি চারিটি শক্তিই শ্রীচক্রের অন্তর্গত ঊর্ধ্বমুখ-যোনিস্বরূপ। এই নবব্যূহাত্মক শক্তিবর্গের জন্য ভগবতীকে নবাত্মক বলে। ইহার প্রকার এইভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে—
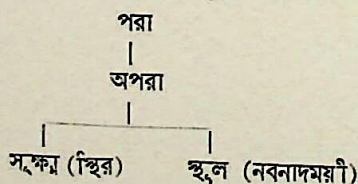
(৭) বিন্দুব্যূহ—ইহা ষট্‌চক্র সঙ্ঘেরই নামান্তর।

(৮) কলাব্যূহ—ইহা বর্ণাত্মক পঞ্চাশটি কলার সমূহ।

(৯) জীবব্যূহ—ইহা ভোক্তৃবৃন্দের নামান্তর।

এই নয়টি ব্যূহ ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যরূপে তিনপ্রকার। ভোক্তা হইতেছেন আত্ম-ব্যূহ, ভোগ জ্ঞানব্যূহ এবং ভোগ্য কালব্যূহাদি সমুদয়। সকল ব্যূহই জীবব্যূহের সর্বত্র অন্বয়যুক্ত। এইজন্য সর্বত্র ঐক্য আছে। কালব্যূহ অবচ্ছেদ; সেইজন্য সেখানেও ঐক্য আছে। কুল ও নাগব্যূহ নিরূপক বলিয়া সেখানেও ঐক্য আছে। বিন্দুব্যূহের সহিত জ্ঞানব্যূহের তাদাত্ম্য আছে, সেইজন্য সেখানেও ঐক্য আছে। নাদ ও কলা এক বলিয়া পরমেশ্বর নবব্যূহাত্মক। এইজন্য ভৈরব ও ভৈরবীর মধ্যে নয়প্রকার ঐক্য অঙ্গীকৃত হয়। ইহাই কৌলমত। এজন্য কৌলমতে পরমেশ্বর নবাত্মক। কৌলগণ বলেন—

নবব্যূহাত্মকো দেবঃ পরানন্দপরাত্মকঃ।
নবাত্মা ভৈরবো দেবো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥

পরানন্দপরাশক্তিশ্চিদ্রূপানন্দভৈরবী।
তয়োর্যদা সামরস্যং সৃষ্টিরুৎপদ্যতে তদা॥

আনন্দভৈরব ও পরা উভয়ের তাদাত্ম্য আছে। উভয়েই সমরূপে নবাত্মক। তবে যে শেষশেষিভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক। যখন সৃষ্ট্যাদিতে উভয়ের প্রযত্ন উৎপন্ন হয় তখন ভৈরবীর প্রাধান্যবশতঃ মহাভৈরবী প্রধান, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হন। তাঁহার এই প্রধানতাই শেষিত্ব। আনন্দভৈরব তখন অপ্রধান, গৌণ, শেষ। সর্বোপসংহার-কালে প্রকৃতি তন্মাত্রে অবস্থিত হয় এবং ভৈরবী স্বাত্মাতে অন্তর্ভূত হন। তখন ভৈরব শেষী, ভৈরব শেষ। সংহারকালে কার্যকারণের উপসংহারের পর স্বয়ং কারণ-রূপে স্থিতি হয়। এইটিই হইল পূর্ব কৌলমতের সারাংশ।

উত্তর কৌলগণ বলেন যে প্রধানই জগৎকর্তৃ। প্রধান বলিয়া তাঁহার শেষভাব হয় না, কারণ এই দৃষ্টিতে শিব নাই। তিনি পঞ্চতত্ত্বরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। মনস্তত্ত্বাদিরূপে প্রধানাত্মিকা শক্তিরই পরিণাম হয়। তত্ত্ববর্গ স্বরূপ-পরিণাম। শক্তি যখন কার্য-রূপ সমস্ত প্রপঞ্চকে নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া কারণ-রূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার সংজ্ঞা হয় আধার-কুণ্ডলিনী। ইহাই সংক্ষেপতঃ পূর্বকৌলমত হইতে উত্তর কৌলমতের বৈলক্ষণ্য।

৪

লক্ষ্মীধর যে কৌলমতের উপর বিরূদ্ধ সমালোচনা বা আক্ষেপ করিয়াছেন তাহার উত্তরে ভাস্কর রায় 'সেতুবন্ধে' (পৃ-২৪) বলিয়াছেন যে এ সব কথা ভ্রান্তিমূলক অথবা প্রতারণামাত্র। এইজন্য তিনি এই সমালোচনাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। কোনো কোনো তন্ত্রে যে কৌলধর্মের নিন্দাদি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তৎ-তৎ-তন্ত্রের স্তুতিমাত্র মনে করা উচিত—এইরূপ তন্ত্রাচার্যগণ বলিয়া থাকেন। কারণ কৌলগ্রন্থেই এই ভাবের সমর্থক শিবের বচন বা শিবোক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

> পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি।
> মূর্ত্যন্তরং তু সংপ্রাপ্য মোহনায় দুরাত্মনাম্॥
> মহাপাপবশাননূণাং তেষু বাঞ্ছাঽভিজায়তে।
> তেষাং হি সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥

আসল কথা এই—কৌল উপাসনা চরম ভূমি। ইহার অধিকারী একান্তই দুর্লভ। তাই অধিকারসম্পন্ন না হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলে বিরূদ্ধাচার অবশ্যম্ভাবী। তাই ঐ সকল শাস্ত্রের নিন্দা করা হইয়া থাকে। অধিকারী হইলেও অতি রহস্য বিষয়ে যেন সাধারণতঃ কাহারও প্রবৃত্তি না হয়, ইহাই নিন্দার কারণ। সেইজন্য কুলার্ণবে দেখিতে পাওয়া যায়—

> কুলমার্গরতো দেবি ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।
> আচাররহিতা যেঽত্র নিন্দিতাস্তে ন চাপরে॥
>
> (সেতুবন্ধ, পৃঃ ২৫)

অন্যত্রও আছে—

> কুলধর্মমিমং জ্ঞাত্বা মুচ্যেয়ুঃ সর্বমানবাঃ।
> ইতি মত্বা কুলেশানি ময়া লোকে বিগর্হিতম্॥

* * * * *

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে কুলপ্রক্রিয়ায় দূতী ব্যতীত কোনো কর্মে অধিকার জন্মে না। প্রসিদ্ধি আছে, পুরুষের পক্ষে যে-সিদ্ধি লাভ করিতে এক বৎসর লাগে তত্ত্বনিষ্ঠা স্ত্রীদের পক্ষে তাহা লাভ করিতে বারোদিনের অধিক সময় আবশ্যক হয় না। তাই নিয়ম আছে—

> অতঃ সুরূপাং সুভগাং সরূপাং ভাবিতাশয়াম্।
> আদায় যোষিতং কুর্যাদর্চনং যজনং হুতম্॥
>
> (তন্ত্রালোকটীকা, ১।১৩)

কৌলসম্প্রদায়ের একটি শাখার নাম সাংসারিক কুলাম্নায়। ইহার প্রবর্তক ছিলেন অল্লট অথবা ভাবরক্ত, যিনি বিশ্বরূপ নামক একজন পাশুপত সাধুর শিষ্য প্রশস্তের অন্তেবাসী ছিলেন। এই বিশ্বরূপ পঞ্চার্থ লাকুলাম্নার সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হইতে প্রতীত হয় যে পাশুপত ও কৌলসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কৌলাচার্য মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথকে সাধারণতঃ পাশুপত বলিয়া সম্মান করা হয়, ইহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সিদ্ধ যোগীশ্বরীমতের ধারা লকুলীশের মধ্য দিয়া তাঁহার শিষ্য অনন্ত ও অনন্তের শিষ্য গহনেশ বা গহনাধিপতি কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়াছিল। সিদ্ধযোগীশ্বরীমতের আচার্যক্রম সম্বন্ধে তন্ত্রালোকে আছে (১২ আহ্নিক, পৃঃ ৩৮৩)—

পূর্বোক্ত বিশ্বরূপ যে অনন্তগোত্র ছিলেন, তাহা জানা যায়। (Dr. V. S. Pathak—Śaivism in early medieval India p. 28)।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে (১।২৩) কৌলসাধনারও কৌল ভৈরবানন্দের প্রসঙ্গ আছে। উহাতে কৌলমতের কোনো নিন্দা নাই। জানা যায় যে ভৈরবী বা ভৈরবচক্রে কৌলগণ শক্তি উপাসনার জন্য একত্র হইতেন। ঐ সময় তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকিত না। প্রত্যেক উপাসককে তৎকালস্থায়ী বিবাহ করিতে হইত এবং কুলাঙ্গনারূপে যাহাদিগকে গ্রহণ করা হইত, তাহারা অধিকাংশস্থলে সমাজের নিম্নস্তরের জাতিভুক্ত হইত, যেমন ধোপানী, নাপিতানী, নর্তকী ইত্যাদি।

'গুহ্যসমাজে' (৩০০-৪০০ খৃষ্টাব্দ) প্রজ্ঞাভিষেকের কথা আছে। তাহাতেও আছে যে অভিষেককর্তা গুরুই শিষ্যের তৎকালোচিত বিবাহের জন্য ঘটকের কার্য করিতেন। তিনি যোগাভ্যাসরতা শক্তিকে হাতে করিয়া লইয়া শিষ্যের হাতে স্থাপন করিতেন। এই বিবাহে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্যতীত চাণ্ডালী, ধোপানী, নটী প্রভৃতি-জাতীয় কন্যারও সমুচিত স্থান ছিল। এই অনুষ্ঠানে সবপ্রকার মাংসই ব্যবহৃত হইত—হাতি, ঘোড়া, গো প্রভৃতি। ('গুহ্যসমাজ', Introduction p. 12 & Chap. XV)।

শ্রীকণ্ঠ 'রত্নত্রয়ে' (পৃঃ ১৪) বলিয়াছেন যে বেদান্ত ও কুলাম্নায় প্রতিপাদনকালে যে চিতিকে আনন্দোপচিতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, ইহা আনন্দবিপ্রলব্ধ অপরিণতমল লোকদিগের কথা। শ্রুতিতে যেখানে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ 'পরিপূর্ণ', সুখ নহে। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ শক্তিপাতের প্রভাবে শিবানুগৃহীত, তাঁহারা আনন্দকে পূর্ণতা বলিয়াই মনে করেন, ভোগের বস্তু মনে করেন না। এখানে টীকাকার অঘোরশিবাচার্য 'কুলাম্নায়' শব্দে শাক্তাদি সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছেন।

৬

লক্ষ্মীরাম তাঁহার 'পরাত্রিংশিকাবিবৃতি'তে (পৃঃ ১-২) বলিয়াছেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন মার্গে পূর্ণত্বে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন ধারাতে একই সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বিভিন্ন শক্তিস্রোত বিভিন্ন ধারাতে একই শিবতত্ত্ব-রূপ পূর্ণ সত্তাকে প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে শৈব, বৈদান্তিক, সাংখ্য, তার্কিক প্রভৃতি জ্ঞানশক্তির স্রোত অবলম্বন করিয়া শিবার্ণবে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে পাতঞ্জল যোগী, হঠ যোগী, পূর্বমীমাংসার অনুসরণকারী প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তির স্রোত অবলম্বন করিয়া পূর্ণে প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কৌলমার্গের উপদেষ্টা ভৈরবভট্টারক ভক্তজনকে অনুগ্রহ করার জন্য স্পন্দ-স্বরূপা পরাদি চতুর্বিধ বাক্‌রূপ স্রোতের দ্বারা অকুলে প্রবেশ করিবার মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। কৌলমতে এই মার্গেরই নাম প্রকৃত রাজযোগ। ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সংঘট্টাত্মক। এই সংঘট্টই অনুত্তর নামক জ্ঞানক্রিয়াত্মক অধ্বার নামান্তর। অকার হইতে হকার পর্যন্ত বর্ণমালার বিকাশই এই অনুত্তর অধ্বার স্বরূপ।

এই অনুত্তরই অবিলম্বে কৌলিক সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞাত হইলেই অনুত্তরমাত্র চিদেকরূপ আত্মার শক্তিসকলের স্বাতন্ত্র্যাত্মক সাম্য লাভ হয়। ইহাকেই মুক্তি বলে। কুলদেহে উদ্ভূত যে সিদ্ধি, যাহা চিৎতত্ত্বের সহিত একাত্মতা-রূপে বর্ণিত হয়, উহাই কৌলিক সিদ্ধি। জড় দেহাদিও চিৎতত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যসম্পন্ন। এই জ্ঞান দৃঢ় হইলেই জীবন্মুক্তি ফুটিয়া থাকে। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ের ষোড়শ সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে—

দেহাদিষু চেত্যমানেষ্বপি চিদৈকাত্ম্যপ্রতিপত্তিদার্ঢ্যং জীবন্মুক্তিঃ।

লক্ষ্মীরাম 'প্রত্যভিজ্ঞাসূত্র'কে শক্তি-সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই যে কৌলিকী শক্তি ইহা হৃদয়স্থিতা চিৎ-শক্তি এবং দেহাদির ব্যাপিকা। ইহাকে 'কুলনায়িকা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহার তাৎপর্য এই যে ইহা 'কুল' বা দেহের 'নায়িকা' অর্থাৎ ইহা হইতেই বা ইহার প্রভাবেই চিতের সহিত দেহের একাত্মতা সিদ্ধ হয়।

ইহার পরই 'পরাত্রিংশিকা'তে কৌলিক বিধি বলা হইয়াছে, যাহা ভৈরবের হৃদয়াকাশে

স্থিত। এই বিধি দ্বারা জড় দেহাদিও চিদেকরস হইয়া যায়। অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডকে অগ্নিময় করে তদ্রূপ ইহা দেহকে চিন্ময় করে। এই বিধিটি কি? অ হইতে বিন্দু পর্যন্ত অর্থাৎ অংকার পর্যন্ত পনেরটি স্বরবর্ণ পনেরটি তিথিস্বরূপ। সংবিৎ প্রথমে প্রাণে পরিণত হয়। চন্দ্র ও সূর্য প্রাণ ও অপানেরই নাম। ঐ সকল বর্ণের উচ্চারমধ্যে কালের কলনা সূক্ষ্ম ক্রিয়াশক্তির সম্বন্ধবশতঃ প্রাণ ও অপান-রূপে পরিণত হয়। প্রতিপদাদি তিথিসকল সূর্য ও চন্দ্রের সন্নিকর্ষ ও বিপ্রকর্ষ দ্বারা এবং কালসম্বন্ধ দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

অ হইতে বিসর্গ শিবতত্ত্ব। ক হইতে ঙ পর্যন্ত পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত। চ হইতে ঞ পর্যন্ত গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রা। ট হইতে ণ পাদাদি বাক্‌পর্যন্ত পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। ত হইতে ন পর্যন্ত ঘ্রাণাদি শ্রোত্রপর্যন্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। প হইতে ম পর্যন্ত মন, অহংকার, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও পুরুষ। য হইতে ব পর্যন্ত বায়বী ধারণা, আগ্নেয়ী ধারণা, বারুণী ধারণা ও ঐন্দ্রী বা পার্থিব ধারণা।

পার্থিব ধারণা = দেহব্যাপক সূর্যরূপ প্রণবচিন্তন। আগ্নেয়ী = দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে উত্থিত অগ্নিজ্বালা দ্বারা বাহ্য ও আন্তর ভস্মীভূত হইয়াছে—এই ভাবনা। বায়বীয় ধারণা = চণ্ডবায়ু দ্বারা শরীরের ভস্মরাশি, যাহা সর্বদিকে ছড়াইয়া যায়—এইরূপ চিন্তন। বারুণী ধারণা = দ্বাদশান্ত হইতে পতিত শাক্তামৃত দ্বারা তৎস্থানের প্রক্ষালন সম্পন্ন হইয়াছে, এইরূপ ভাবনা। ইহার পর কুণ্ডলিনীর সঙ্গে ব্যোমস্থিত জীবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা অমৃতদ্বারে হৃদয়ে অবতারণ। অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণসৃষ্টির মূল সমবায়ী কারণ হইতেছে 'অ'।

'তন্ত্রালোকে' (৩।১৭) আছে যে অকুল-দেবের কুলপ্রথনশালিনী কৌলিক পরা-শক্তি আছে, ইহা তাঁহার সঙ্গে নিত্যযুক্ত। এই প্রসঙ্গে টীকাকার যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই—

৭

এখন কাপালিকমত ও সোমমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলা যাইতেছে।

যামুন মুনিকৃত 'আগমপ্রামাণ্যে'র মতে চারিটি শৈবমতের মধ্যে কাপালিকমত অন্যতম। শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতার মতও এইরূপ। বামনপুরাণেও এইরূপ উল্লেখ আছে, তবে সেখানে 'কাপালিক' শব্দের পরিবর্তে 'কপালী' শব্দ পাওয়া যায়। ভামতীকার বাচস্পতি-মিশ্র কাপালিকমতকে চারিটি মাহেশ্বর মতের অন্যতম বলিয়াছেন। এক সময়ে এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষে চারিদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা কতদিনের পুরাতন তাহা বলা যায় না, তবে মধ্যযুগে অন্যান্য মতের ন্যায় ইহাও চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন নাম সোমসিদ্ধান্ত বা মহাব্রত। শ্রীহর্ষ 'নৈষধে' বলিয়াছেন—

যা সোমসিদ্ধান্তময়াননেব
শূন্যাত্মভাবাদনয়োদরেব।
বিজ্ঞানসামস্ত্যময়ান্তরেব
সাকারতাসিদ্ধিময়াখিলেব॥ (১০, ৮৭)

কাপালিক অর্থে সোমসিদ্ধান্ত শব্দের প্রয়োগ 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'ও পাওয়া যায়। রুচিকর স্বরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকাতে বলেন যে সোমশব্দের অর্থ উমাসহিত অর্থাৎ পার্বতী-সহিত শিবের যে সিদ্ধান্ত, তাহাই সোমসিদ্ধান্ত। রুচিকর আপন টীকাতে বলেন—'সহ উময়া বর্ততে ইতি সোমঃ, তস্য সিদ্ধান্তঃ' (তৃতীয় অংক)। প্রকাশ ও চন্দ্রিকা টীকাতেও এই ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় এই সম্প্রদায় কোনো সময়ে শৈব সম্প্রদায়ভুক্তই ছিল। রঘূত্তম ন্যায়ভাষ্য-টীকা ভাষ্যচন্দ্রে সোম্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন (চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃঃ ৩০)। অকুল-বীরতন্ত্রে (পৃঃ ১০৫) অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সোমসিদ্ধান্তীর নিন্দা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে এই সকল সম্প্রদায়ের লোক পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারে না। যথা—

ন বিন্দন্তি পদং শান্তং কৈবল্যং নিষ্ক্রিয়ং গুরুম্।
সাংখ্যাদয়স্তু যে কেচিৎ ন্যায়বৈশেষিকাস্তথা।
বৌদ্ধহস্তাশ্চ যে কেচিৎ সোমসিদ্ধান্তদর্শিনঃ॥

[নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে এই পুস্তক আছে। কিছুকাল পূর্বে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি ইহার সম্পাদন করিয়া Calcutta Sanskrit Seriesএ ইহা প্রকাশিত করেন (No. 3, 1934)। ইতালীয় অধ্যাপক তুচ্চি (Professor Tucci) "Animadversiones Indicae" in JASB (New Series NS 1930, p. 130)তে দরবার লাইব্রেরীর পুস্তক হইতে শ্লোকগুলি একটু অন্যভাবে উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

... ... শান্তং শৈলানাং (?) নিষ্কলম্।
সংবাদন্তি (?) যে কেচিৎ পাশং (বা ন্যায়) ... ...॥

বৌদ্ধান্তরি হন্তা (?) যে সোমসিদ্ধান্তবাদিনঃ।
মীমাংসা পঞ্চস্রোতশ্চ বামসিদ্ধান্তদক্ষিণঃ (?)॥]

সুপ্রভেদাগমে সৌম নামক চারিটি শৈব সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে। তাহা বোধ হয় এই সোমসিদ্ধান্তী। ঈশানশিবগুরুপদ্ধতি-ধৃত স্বায়ম্ভুব মতে শিবভাষিত তন্ত্রই হইল সোমতন্ত্র। (তৃতীয় খণ্ড, ক্রিয়াপাদ)

বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের লোক মহাব্রতীও ছিল। ইগাৎপুরীতে (নাসিক জিলা) যে লেখ (৬২০ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কপালেশ্বরের পূজার কথা আছে এবং মন্দিরে মহাব্রতীদের ভোজনাদির ব্যবস্থার জন্য দানের কথা আছে। (Eliot: Hinduism & Buddhism, Part II, p. 203, footnote 4) শিবপুরাণ ও স্বায়ম্ভুব আগমে (ঈশানশিব-গুরুপদ্ধতিধৃত) মহাব্রতীদের কথা পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমরা এখানে প্রধানতঃ কৌল-সম্প্রদায়ের সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম এবং কাপালিক ও সৌম্যমতের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। ইহা ভিন্ন পাশুপত, রসেশ্বরাদি অসংখ্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তারভয়ে সেগুলির আলোচনা বর্তমানে করা হইল না। তান্ত্রিক সম্প্রদায় সম্বন্ধেও গবেষণার যে বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, তাহার দিকে তরুণ গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই দিগ্‌দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৭

এখন কাপালিকমত ও সৌম্যমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলা যাইতেছে।

যামুন মুনিকৃত 'আগমপ্রামাণ্যে'র মতে চারিটি শৈবমতের মধ্যে কাপালিকমত অন্যতম। শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতার মতও এইরূপ। বামনপুরাণেও এইরূপ উল্লেখ আছে, তবে সেখানে 'কাপালিক' শব্দের পরিবর্তে 'কপালী' শব্দ পাওয়া যায়। ভামতীকার বাচস্পতি-মিশ্র কাপালিকমতকে চারিটি মাহেশ্বর মতের অন্যতম বলিয়াছেন। এক সময়ে এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষে চারিদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা কতদিনের পুরাতন তাহা বলা যায় না, তবে মধ্যযুগে অন্যান্য মতের ন্যায় ইহাও চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন নাম সোমসিদ্ধান্ত বা মহাব্রত। শ্রীহর্ষ 'নৈষধে' বলিয়াছেন—

> যা সোমসিদ্ধান্তময়াননেব
> শূন্যাত্মভাবাদনয়োদরেব।
> বিজ্ঞানসামস্ত্যময়ান্তরেব
> সাকারতাসিদ্ধিময়াখিলেব॥ (১০, ৮৭)

কাপালিক অর্থে সোমসিদ্ধান্ত শব্দের প্রয়োগ 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'ও পাওয়া যায়। রুচি-কর স্বরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকাতে বলেন যে সোমশব্দের অর্থ উমাসহিত অর্থাৎ পার্বতী-সহিত শিবের যে সিদ্ধান্ত, তাহাই সোমসিদ্ধান্ত। রুচিকর আপন টীকাতে বলেন—'সহ উময়া বর্ততে ইতি সোমঃ, তস্য সিদ্ধান্তঃ' (তৃতীয় অঙ্ক)। প্রকাশ ও চন্দ্রিকা টীকাতেও এই ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় এই সম্প্রদায় কোনো সময়ে শৈব সম্প্রদায়ভুক্তই ছিল। রঘূত্তম ন্যায়ভাষ্য-টীকা ভাষ্যচন্দ্রে সোম্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন (চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃঃ ৩০)। অকুল-বীরতন্ত্রে (পৃঃ ১০৫) অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সোমসিদ্ধান্তীর নিন্দা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে এই সকল সম্প্রদায়ের লোক পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারে না। যথা—

> ন বিন্দন্তি পদং শান্তং কৈবল্যং নিষ্ক্রিয়ং গুরুম্।
> সাংখ্যাদয়স্তু যে কেচিৎ ন্যায়বৈশেষিকাস্তথা।
> বৌদ্ধহস্তাশ্চ যে কেচিৎ সোমসিদ্ধান্তদর্শিনঃ॥

[নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে এই পুস্তক আছে। কিছুকাল পূর্বে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি ইহার সম্পাদন করিয়া Calcutta Sanskrit Seriesএ ইহা প্রকাশিত করেন (No. 3, 1934)। ইতালীর অধ্যাপক তুচ্চি (Professor Tucci) "Animadversiones Indicae" in JASB (New Series NS 1930, p. 130)তে দরবার লাইব্রেরীর পুস্তক হইতে শ্লোকগুলি একটু অন্যভাবে উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

> ... ... শান্তং শৈলানাং (?) নিষ্কলম্।
> সংবাদন্তি (?) যে কেচিৎ পাশং (বা ন্যায়) ... ...॥

বৌদ্ধান্তরি হন্তা (?) যে সোমসিদ্ধান্তবাদিনঃ।
মীমাংসা পঞ্চস্রোতশ্চ বামসিদ্ধান্তদক্ষিণঃ (?)॥]

সূপ্রভেদাগমে সৌম নামক চারিটি শৈব সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে। তাহা বোধ হয় এই সোমসিদ্ধান্তী। ঈশানশিবগুরুপদ্ধতি-ধৃত স্বায়ম্ভুব মতে শিবভাষিত তন্ত্রই হইল সোমতন্ত্র। (তৃতীয় খণ্ড, ক্রিয়াপাদ)

বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের লোক মহাব্রতীও ছিল। ইগাৎপুরীতে (নাসিক জিলা) যে লেখ (৬২০ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কপালেশ্বরের পূজার কথা আছে এবং মন্দিরে মহাব্রতীদের ভোজনাদির ব্যবস্থার জন্য দানের কথা আছে। (Eliot: Hinduism & Buddhism, Part II, p. 203, footnote 4) শিবপুরাণ ও স্বায়ম্ভুব আগমে (ঈশানশিব-গুরুপদ্ধতিধৃত) মহাব্রতীদের কথা পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমরা এখানে প্রধানতঃ কৌল-সম্প্রদায়ের সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম এবং কাপালিক ও সৌম্যমতের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। ইহা ভিন্ন পাশুপত, রসেশ্বরাদি অসংখ্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তারভয়ে সেগুলির আলোচনা বর্তমানে করা হইল না। তান্ত্রিক সম্প্রদায় সম্বন্ধেও গবেষণার যে বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, তাহার দিকে তরুণ গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই দিগ্‌দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দশ শিবাগম

আগমসাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে পরম্পরাপ্রসিদ্ধ আগমসকলের উল্লেখ আবশ্যক। বলা বাহুল্য এই প্রসঙ্গে শুধু শৈবাগম ও শাক্তাগমের কথাই বলা হইতেছে। বৈষ্ণবাদি অন্যান্য আগমের বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তান্ত্রিক সাহিত্যের ইতিহাসে দশটি শিবাগম ও আঠারটি রুদ্রাগম একসঙ্গে অষ্টাবিংশ আগম নামে পরিচিত। কোনো কোনো স্থানে এইসকল আগমকে সাধারণতঃ দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত দৃষ্টির সমর্থক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও সর্বত্রই ইহাদের প্রামাণ্য সমরূপে অঙ্গীকৃত হয়। পৌষ্কর আগম অনুসারে সিদ্ধান্তশাস্ত্র বলিতে এই উভয় প্রকার শৈবমতই গৃহীত হইয়া থাকে। প্রতি আগমেই বিদ্যা, যোগ, ক্রিয়া ও চর্যা নামে চারিটি পাদ থাকে, কিন্তু সর্বত্র এইপ্রকার সর্বাঙ্গসমন্বিত আগমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। কোনো কোনো আগমের একাধিক পাদ পাওয়া গেলেও সকল আগমেরই চারিটি পাদ ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। আগমসাহিত্য অতি বিশাল, কিন্তু ইহার বহু গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে তাহা ইহার পূর্ণরূপের কণামাত্রও নহে। দুঃখের বিষয় এই কণাও বর্তমান সময়ে অযত্ন ও অনাদরবশতঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় বৈদিক সাহিত্যের ন্যায় আগম সাহিত্যের আলোচনারও একটি বিশিষ্ট উচ্চস্থান আছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিরণাগমে আছে যে, জগৎ সৃষ্টির পর পরমেশ্বর সর্বপ্রথম দশটি শিবকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তাঁহার অবিভক্ত মহাজ্ঞানের এক একটি ভাগ প্রদান করেন। এই অবিভক্ত মহাজ্ঞানই মূল শিবাগম। বেদ যেমন স্বরূপতঃ এক ও অখণ্ড মহাজ্ঞানস্বরূপ কিন্তু বিভক্ত হইয়া তিন বা চারিরূপে পরিণত হয়, আগমও তেমনি মূলে এক থাকিলেও বিভক্ত হইয়া বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই যে দশটি শিবের সহিত সংশ্লিষ্ট দশটি ধারার কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে প্রত্যেকটি ধারাতেও পরম্পরা আছে। তদনুসারে দশটি শিবের প্রথম শিবের নাম প্রণবশিব। তিনি পরমেশ্বর হইতে যে আগম প্রাপ্ত হন তাহার নাম কামিক। শুনা যায় ইহার শ্লোক-সংখ্যা পরার্ধপরিমাণ ছিল। প্রণবশিব হইতে এই আগম প্রাপ্ত হন ত্রিকল এবং ত্রিকল যাঁহাকে ইহা প্রদান করেন তাঁহার নাম হর। কিরণাগম ও কামিকাগম উভয়ত্রই 'কামিক' নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্ত্রালোকের টীকাকার জয়রথের উদ্ধৃত শ্রীকণ্ঠসংহিতা মতে ইহার নাম কামজ।

দ্বিতীয় আগমের নাম যোগজ। ইহার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। ইহার পাঁচটি ভেদ

আছে। সুধা-নামক শিব ইহা প্রথম প্রাপ্ত হন, তাঁহা হইতে ভস্ম ও ভস্ম হইতে প্রভু।

তৃতীয় আগম চিন্ত্য। ইহারও পরিমাণ এক লক্ষ। ইহার ছয়টি ভেদ আছে। ইহা প্রথম প্রাপ্ত হন দীপ্ত, দীপ্ত হইতে গোপতি ও গোপতি হইতে অম্বিকা।

চতুর্থ আগম কারণ। ইহার পরিমাণ এক কোটি। ইহার সাতটি ভেদ আছে। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন কারণ, কারণ হইতে শর্ব ও শর্ব হইতে প্রজাপতি।

পঞ্চম আগম অজিত। ইহার পরিমাণ এক লক্ষ। ইহার চারিটি ভেদ আছে। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন সুশিব, সুশিব হইতে উমেশ ও উমেশ হইতে অচ্যুত।

ষষ্ঠ আগম সুদীপ্তক। ইহার পরিমাণ এক লক্ষ। ইহার নয়টি ভেদ আছে। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন ঈশ এবং ঈশ হইতে ত্রিমূর্তি এবং ত্রিমূর্তি হইতে হুতাশন।

সপ্তম আগম সূক্ষ্ম। ইহার পরিমাণ এক পদ্ম। ইহার কোনো ভেদ নাই। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে ভব ও ভব হইতে প্রভঞ্জন।

অষ্টম আগমের নাম সহস্র। ইহার দশ ভেদ আছে। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন কাল, কাল হইতে ভীম ও ভীম হইতে খগ।

নবম আগমের নাম সুপ্রভেদ। ইহার পরিমাণ তিন কোটি। ইহার কোনো ভেদ নাই। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন ধনেশ, ধনেশ হইতে বিশ্বেশ ও তাঁহা হইতে শশী।

দশম আগমের নাম অংশুমান্। ইহার দ্বাদশ ভেদ আছে। ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন অংশু, তাঁহা হইতে অগ্র, এবং অগ্র হইতে রবি।

এই দশটি নাম কিরণাগমসম্মত। শ্রীকণ্ঠীসংহিতাপ্রদত্ত সূচীতে সুপ্রভেদের নাম নাই। তাহার স্থানে মকুট বা মুকুটাগমের নাম আছে। মুকুটাগম অনুসারে শিবজ্ঞানসকলের শ্রোতা তিন তিনজন থাকার দরুণ শিবজ্ঞানের সংখ্যা ত্রিশ (১০×৩)।

২

অষ্টাদশ রুদ্রাগম

এইবার অষ্টাদশ রুদ্রাগমের কথা বলা যাইতেছে। এই সকল আগমের নাম ও তাহাদের প্রত্যেকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রোতার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম—**বিজয়**। ইহার প্রথম শ্রোতা অনাদিরুদ্র ও দ্বিতীয় শ্রোতা পরমেশ্বর।
দ্বিতীয়—**নিঃশ্বাস**। প্রথম শ্রোতা দশার্ণ, দ্বিতীয় শৈলজা।
তৃতীয়—**পারমেশ্বর**। প্রথম শ্রোতা রূপ, দ্বিতীয় উশনা।
চতুর্থ—**প্রোদ্‌গীত**। প্রথম শ্রোতা শূলী, দ্বিতীয় কচ।
পঞ্চম—**মুখবিম্ব**। প্রথম শ্রোতা প্রশান্ত, দ্বিতীয় দধীচি।
ষষ্ঠ—**সিদ্ধ**। প্রথম শ্রোতা বিন্দু, দ্বিতীয় চণ্ডেশ্বর।
সপ্তম—**সন্তান**। প্রথম শ্রোতা শিবলিঙ্গ, দ্বিতীয় হংসবাহন।
অষ্টম—**নারসিংহ**। প্রথম শ্রোতা সৌম্য, দ্বিতীয় নৃসিংহ।
নবম—**চন্দ্রাংশু বা চন্দ্রহাস**। প্রথম শ্রোতা অনন্ত, দ্বিতীয় বৃহস্পতি।
দশম—**বীরভদ্র**। প্রথম শ্রোতা সর্বাত্মা, দ্বিতীয় বীরভদ্র-মহাগণ।
একাদশ—**স্বায়ম্ভুব**। প্রথম শ্রোতা নিধন, দ্বিতীয় পদ্মজ।
দ্বাদশ—**বিরক্ত**। প্রথম শ্রোতা তেজ, দ্বিতীয় প্রজাপতি।
ত্রয়োদশ—**কৌরব্য**। প্রথম শ্রোতা ব্রহ্মণেশ, দ্বিতীয় নন্দিকেশ্বর।
চতুর্দশ—**মাকুট বা মুকুট**। প্রথম শ্রোতা শিবাখ্য বা ঈশান, দ্বিতীয় মহাদেব ধ্বজাশ্রয়।
পঞ্চদশ—**কিরণ**। প্রথম শ্রোতা দেবপিতা, দ্বিতীয় রুদ্র-ভৈরব।
ষোড়শ—**গলিত**। প্রথম শ্রোতা আলয়, দ্বিতীয় হুতাশন।
সপ্তদশ—**আগ্নেয়**। প্রথম শ্রোতা ব্যোমশিব, দ্বিতীয় নাম পাওয়া যায় না।
অষ্টাদশ— ? । ? ?

শ্রীকণ্ঠীতে যে রুদ্রাগমের সূচী আছে তাহাতে অধিক আছে রৌরব, বিমল, বিসর ও সৌরভেয় এবং নাই বিরক্ত, কৌরব্য, মাকুট ও আগ্নেয়। এইস্থলে কৌরব্য বস্তুত রৌরব হইতে পারে, বাকি তিনটি আলাদা আলাদা। অষ্টাদশ আগমটির নাম কোথাও পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে কিরণ, পারমেশ্বর ও রৌরব এই তিন আগমের নাম তন্ত্রালোকে আছে। মুকুট-তন্ত্রমতে রুদ্রভেদ দ্বিবিধ। এইজন্য রুদ্রজ্ঞান ষট্‌ত্রিংশ (১৮×২)। অতএব মোট সিদ্ধান্তজ্ঞান ছেষট্টিপ্রকার অর্থাৎ শিবভেদ ১০×৩=৩০ ও রুদ্রভেদ ১৮×২=৩৬। সমষ্টি—৬৬।

নেপালে অষ্টম শতকের গুপ্তাক্ষরে (scriptএ) লিখিত **নিঃশ্বাসতত্ত্বসংহিতা** নামে একখানি পুঁথি আছে। ইহাতে লৌকিক ধর্ম, মূলসূত্র, উত্তরসূত্র, নয়সূত্র ও গুহ্যসূত্র নামে পাঁচটি সূত্র বা বিভাগ আছে। লৌকিকসূত্রটি উপেক্ষিতপ্রায়, বাকি চারিটি সূত্রের মধ্যে উত্তরসূত্রটিকে আদিসূত্র ও নয়সূত্রকে প্রথমসূত্র নামে অভিহিত করা হয়। উত্তরসূত্রে আঠারটি প্রাচীন শিবসূত্রের নাম আছে। এই নামগুলি বস্তুতঃ উক্ত নামে প্রচলিত আগমেরই নাম। নামকয়টি এই—নিঃশ্বাস, স্বায়ম্ভুব, বাতুল, বীরভদ্র, রৌরব, মুকুট বা মাকুট, বিরস

(=বীরেশ ?), চন্দ্রহাস, জ্ঞান, মুখবিম্ব, প্রোদ্গীত, ললিত, সিদ্ধ, সন্তান, সর্বোদ্গীত, কিরণ ও পারমেশ্বর। উহাতে দশটি "শিবতন্ত্রে"র নাম আছে—কামিক, যোগজ, দিব্য (চিন্ত্য), কারণ, অজিত, দীপ্ত, সূক্ষ্ম, সাহস্র, অংশুমান্ ও সুপ্রভেদ।

ব্রহ্মযামলে (লিপিকাল খৃঃ ১০৫২) ৩৯শ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়—

বিজয়, নিঃশ্বাস, স্বায়ম্ভুব, বাথুল, বীরভদ্র, রৌরব, মুকুট, বীরেশ, চন্দ্রজ্ঞান, প্রোদ্গীত, ললিত, সিদ্ধিসন্তানক, সর্বোদ্গীত, কিরণ ও পরমেশ্বর। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত নেপাল দরবার ক্যাটালগ ২য় ভাগ, পৃ. ৬০)।

কামিকাগমেও অষ্টাদশতন্ত্রের নাম আছে।

কিরণাগমের একখানি পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে দেখিয়াছিলেন। লিপিকাল ৯২৪ খৃষ্টাব্দ। Bendell বলেন Cambridge University Libraryতে পারমেশ্বর আগমের ৮৯৫ খৃষ্টাব্দের হস্তলিখিত পুঁথি আছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচির মতে নয়োত্তর সূত্রের (নিঃশ্বাসতন্ত্রের) রচনাকাল বোধহয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। ব্রহ্মযামল মতে নিঃশ্বাসাদি তন্ত্র শিবের মধ্যস্রোত হইতে উদ্ভূত ও ঊর্ধ্ববক্ত্রবিনির্গত। ব্রহ্মযামলে অন্যত্র ইহাও আছে যে সম্মোহ, নয়োত্তর অথবা শিরশ্ছেদ বামস্রোত হইতে উদ্ভূত। জয়দ্রথযামলেও আছে যে শিরশ্ছেদ, নয়োত্তর, মহাসম্মোহন—এই তিনটি বামস্রোত হইতে উদ্ভূত।

দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত শৈবাগম যে অতি প্রাচীন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, তবে আমরা এখন যে-আকারে উহাদিগকে প্রাপ্ত হই এবং মধ্যযুগেও যে-আকারে উহাদিগের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অতি প্রাচীন রূপ নহে। কালভেদে নানা ঐতিহাসিক কারণে এই প্রকার রূপান্তর সংঘটিত হইয়া থাকিবে। তথাপি এইপ্রকার অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে মধ্যযুগে প্রচলিত পঞ্চরাত্র-আগমের অতি প্রাচীনরূপ যেমন মহাভারতে শান্তিপর্বে দৃষ্ট হয় তেমনি এই সকল শৈবাগম সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। মহাভারতের মোক্ষপর্বে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যুর নিকট দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত শৈবাগম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কামিকাগমে আছে যে, সদাশিবের পঞ্চমুখের প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঁচটি স্রোতের সম্বন্ধ আছে, সেইজন্য মোট স্রোতের সংখ্যা পাঁচশটি। প্রতি মুখের পাঁচটি স্রোতের নাম এই—প্রথম লৌকিক, দ্বিতীয় বৈদিক, তৃতীয় আধ্যাত্মিক, চতুর্থ অতিমার্গ ও পঞ্চম মন্ত্র। পঞ্চমুখের নাম—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান।

সোমসিদ্ধান্তে আছে যে লৌকিকতন্ত্র পাঁচ প্রকার, বৈদিক পাঁচপ্রকার, আধ্যাত্মিক পাঁচপ্রকার, অতিমার্গ পাঁচপ্রকার, মন্ত্রতন্ত্র পাঁচপ্রকার। আচার্য সর্বাত্মশম্ভু তাঁহার 'সিদ্ধান্ত-দীপিকা'তে লৌকিকাদি পাঁচটি প্রকারের বিবরণ দিয়াছেন। (উমাপতিকৃত শতরত্ন, পৃ. ৯)।

এইসকল তন্ত্রের মধ্যে পরস্পর আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিচারও আছে। তদনুসারে

ঊর্ধ্বাদি পঞ্চদিকের ভেদবশতঃ তন্ত্রসকল উৎকর্ষ সম্বন্ধে তারতম্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিক্ হইতে নির্গত তন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ, তদনন্তর পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এই ক্রম অনুসারে সিদ্ধান্তবিদ্‌গণের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তজ্ঞান মুক্তিপ্রদ বলিয়া সর্বোৎকৃষ্ট; তদনন্তর ক্রম অনুসারে সর্পবিষহারক গারুড়জ্ঞান, সর্ববশীকরণ-প্রতিপাদক কামজ্ঞান, ভূতনিবারক ভূততন্ত্র এবং শত্রুক্ষয়ের উপযোগী ভৈরবতন্ত্রের স্থান জানিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। বৈদিক দৃষ্টিতে যেমন স্থূলতঃ জ্ঞানের দুইটি প্রকার বর্ণিত হয়—একটি বোধাত্মক ও অপরটি শব্দাত্মক, তদ্রূপ প্রাচীন তন্ত্র-সাহিত্যেও বোধ-রূপ ও শব্দ-রূপ জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, অববোধাত্মক জ্ঞান যে শব্দাত্মক জ্ঞান হইতে উৎকর্ষসম্পন্ন, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু ইহাও সত্য যে এই বোধরূপী জ্ঞানও একপ্রকার নহে, কারণ প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভেদবশতঃ জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে। যে-জ্ঞান শিব-প্রতিপাদক তাহা হইতে যে-জ্ঞান পশু, মায়া, প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতিপাদক সেই জ্ঞান নিকৃষ্ট। এই জন্যই শুদ্ধমার্গ, অশুদ্ধমার্গ, মিশ্রমার্গ প্রভৃতি জ্ঞানগত ভেদ কল্পিত হয়। শব্দাত্মক জ্ঞান শাস্ত্ররূপ। ইহাও পরাপর ভেদে নানাপ্রকার। সিদ্ধান্তী-মতে বেদাদির জ্ঞান যতই নির্মল হউক্ না কেন সিদ্ধান্তজ্ঞান উহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ, এইজন্য শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধান্ত-জ্ঞানেরও পরাপর ভেদ আছে।

এই প্রকার দীক্ষারূপ জ্ঞানের নৈষ্ঠিক, ভৌতিক, নির্বীজ, সবীজ, শিবধর্মী, লোক-ধর্মী ইত্যাদি ভেদ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে মূলে জ্ঞান এক হইলেও অর্থ-প্রতিপাদনের তারতম্যবশতঃ পরাপর নানা ভেদে প্রকাশিত হয়। তাই স্বায়ম্ভুব আগমে আছে—

> তদেকমপ্যনেকত্বং শিববক্ত্রাম্বুজোদ্ভবম্।
> পরাপরেণ ভেদেন গচ্ছত্যর্থপ্রতিশ্রয়াৎ॥

কামিকাগমেও আছে যে পর ও অপর ভেদে অধিকারিভেদমূলক দুইপ্রকার জ্ঞান আছে। তন্মধ্যে পতি-প্রতিপাদক জ্ঞান পরজ্ঞান এবং পশু-প্রতিপাদক জ্ঞান অপর জ্ঞান। শিব-প্রকাশক জ্ঞান শিবজ্ঞান, উহা পর বা শ্রেষ্ঠ। পশুপাশাদি-অর্থপ্রকাশক জ্ঞান অপর জ্ঞান। কেহ কেহ বলেন বিলক্ষণতাবশতঃ জ্ঞানে পরত্ব ও অপরত্ব কল্পিত হয়। শিবজ্ঞান ও রুদ্রজ্ঞানকে যে সিদ্ধান্তজ্ঞান বলে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পাশুপত আচার্যগণ আঠারটি রৌদ্রাগমের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু দশটি শিবজ্ঞানের প্রামাণ্য মানিতেন না। ইহার কারণ রৌদ্রাগমে দ্বৈত-দৃষ্টির সঙ্গে অদ্বৈত-দৃষ্টির মিশ্রণ আছে কিন্তু শিবাগমে অদ্বৈত-দৃষ্টি অঙ্গীকৃত হয় না। এইজন্য আচার্য অভিনব-গুপ্তের মতে পাশুপত দর্শন সর্বথা হেয় নহে। কোনো কোনো গ্রন্থে শিবের বিভিন্ন মুখ হইতে যে বিভিন্ন আগমের নির্গম হইয়াছে তাহার বিবরণ আছে। তদনুসারে ইহা জানা যায় যে কামিক, যোগজ, চিন্ত্য, কারণ ও অজিত—এই পাঁচটি শিবাগম শিবের সদ্যোজাত মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। দীপ্ত, সূক্ষ্ম, সহস্র, অংশুমৎ ও সুপ্রভেদ এই পাঁচটি শিবাগম বামদেব নামক মুখ হইতে নিঃসৃত। বিজয়, নিঃশ্বাস স্বায়ম্ভুব, আগ্নেয় ও বীর—এই পাঁচটি রুদ্রাগম শিবের অঘোর-মুখ হইতে নিঃসৃত। রৌরব, মুকুট, বিমলজ্ঞান, চন্দ্রকান্ত

ও বিম্ব—এই পাঁচটি রুদ্রাগম ঈশান-মুখ হইতে নিঃসৃত। প্রোদ্গীত, ললিত, সিদ্ধ, সন্তান, সর্বোক্ত, পরমেশ্বর, কিরণ ও বাতুল—এই আটটি রুদ্রাগম তৎপুরুষ-মুখ হইতে নির্গত। মোট এই আটাশটি আগমের ১৯৮টি বিভাগের কথাও কোনো কোনো গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩

চতুঃষষ্টি ভৈরবাগম।

শ্রীকণ্ঠী সংহিতাতে ৬৪ সংখ্যক ভৈরবাখ্য অদ্বৈতাগমের নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে ৬৪টি অদ্বৈতাগমের নামসূচী এই প্রকার :—

(১) **ভৈরবাষ্টক**—স্বচ্ছন্দভৈরব, চণ্ডভৈরব, ক্রোধভৈরব, উন্মত্তভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, মহোচ্ছুষ্মভৈরব, কপালীশভৈরব। অষ্টমটির নাম জানা যায় না।

(২) **যামলাষ্টক**—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, স্বচ্ছন্দ, রুরু, আথর্বণ, রুদ্র ও বেতালযামল। অষ্টমটির নাম পাওয়া যায় না।

(৩) **মতাষ্টক**—রক্ত, লম্পাট, লক্ষ্মী, চালিকা, পিঙ্গলা, উৎফুল্লক, বিম্বাদ্যমত। অষ্টমটি জানা নাই।

(৪) **মঙ্গলাষ্টক**—পিচুভৈরবী, তন্ত্রভৈরবী, তন্ত্র, ব্রাহ্মীকলা, বিজয়া, চন্দ্রা, মঙ্গলা ও সর্বমঙ্গলা।

(৫) **চক্রাষ্টক**—মন্ত্র, বর্ণ, শক্তি, কলা, বিন্দু, নাদ, গুহ্য ও পূর্ণচক্র।

(৬) **বহুরূপাষ্টক**—অন্ধক, রুরুভেদ, অজ, মল, বর্ণভণ্ট, বিড়ঙ্গ, মাতৃরোদন, জালিম।

(৭) **বাগীশাষ্টক**—ভৈরবী, চিত্রকা, হিংসা, কদম্বিকা, হৃল্লেখা, চন্দ্রলেখা, বিদ্যুল্লেখা, বিদ্যুমৎ।

(৮) **শিখাষ্টক**—ভৈরবীশিখা, বীণাশিখা, বীণামণি, সম্মোহ, ডামর, আথর্বক, কবন্ধ ও শিরশ্ছেদ।

৮০২ খৃষ্টাব্দে যে চারখানি তন্ত্রগ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে কাম্বোজে নীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বীণাশিখা, শিরশ্ছেদ ও সম্মোহ—এই তিনখানির নাম পূর্বোক্ত সূচীতে আছে।

বীণাশিখা ইহা শুদ্ধ নাম। ডঃ প্রবোধ বাগচি যে 'বিনাসিখ' নাম দিয়াছেন তাহা বোধহয় বীণাশিখারই অপভ্রংশ। চতুর্থখানির নাম নয়োত্তর (Studies in the Tantras, Vol. I. বাগচি, পৃ. ২)।

ডঃ বাগচি অনুমান করেন যে নেপালে সংরক্ষিত নিঃশ্বাসতত্ত্বসংহিতা (যাহার বর্ণনা নেপাল দরবার Catalogue-এর প্রথম খণ্ডে ১৩৭ পৃ-তে আছে), অষ্টাদশ রৌদ্রাগমের অন্তর্গত নিঃশ্বাসতন্ত্রেরই নামান্তর। ইহার চারিটি ভাগ বা সূত্র আছে। সবগুলি মিলিয়া নয়োত্তরতন্ত্র নামে পরিচিত। (বাগচি, পৃ. ৫)

৪

চতুঃষষ্টি তন্ত্র—(কুলমার্গ)

ভগবান্ শঙ্করাচার্য কৃত 'আনন্দলহরী' স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

> চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমনুসন্ধায় ভুবনং
> স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধিপ্রসভপরতন্ত্রং পশুপতিঃ।
> পুনস্ত্বন্নির্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনা
> স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্। (শ্লোক ৩১)

ইহাতে পশুপতি সকল ভুবনকে তত্তৎ-সিদ্ধিপ্রদর্শক চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন এইরূপ কথা আছে। প্রতি তন্ত্রই কোনো-না-কোনো পুরুষার্থপ্রদ উপাসনার প্রদর্শক। পরে তিনি জগদম্বার অনুরোধে যাবতীয় পুরুষার্থের একসঙ্গে সংঘটনাকারক এক-মাত্র মহাশক্তির প্রতিপাদক তন্ত্রকে পৃথিবীতে অবতারণ করিয়াছিলেন—এইরূপ কথা আছে। সৌভাগ্যবর্ধনী টীকা মতে এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে দেবী শঙ্করকে বলিয়াছিলেন—"তুমি চৌষট্টিখানা তন্ত্র রচনা করিয়াছ, তাহার সবগুলি সকলপ্রকার পুরুষার্থসাধনার প্রকাশক নহে। তুমি এমন একটি তন্ত্র রচনা কর যাহা এক হইলেও তাহারই মধ্যে সকল পুরুষার্থসাধনের উপায় প্রদর্শিত হইবে।" দেবীর এই অনুরোধ শুনিয়া শঙ্কর কাদিমতাখ্য স্বতন্ত্র তন্ত্র প্রকাশ করেন। অন্যান্য তন্ত্র পরস্পরসাপেক্ষ, কিন্তু এই তন্ত্রখানি অন্যনিরপেক্ষ। সেইজন্য ইহাকে অনাদি তন্ত্ররূপে তান্ত্রিক সমাজে গণনা করা হয়।

টীকাকার লক্ষ্মীধর বলেন যে এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে যে 'অনুসন্ধায়' পাঠ গ্রহণ করা হয়, উহা ঠিক নহে। বিশুদ্ধ পাঠ 'অতিসন্ধায়', 'অনুসন্ধায়' নহে। অতিসন্ধায় পদের অর্থ 'বঞ্চনা করিয়া'। তদনুসারে এই শ্লোকের তাৎপর্য ইহাই যে মহামায়া, শম্বর প্রভৃতি চৌষট্টিখানা তন্ত্র দ্বারা সকল প্রপঞ্চকে বঞ্চনা করা হইয়াছে। এই সকল তন্ত্রের প্রত্যেকটিতে কোনো-না-কোনো সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য দেবীর অনুরোধে ভগবান্ শঙ্কর সকল

পুরুষার্থসাধক একখানা তন্ত্র রচনা করেন। ইহাই মুখ্যভাবে ভগবতীর তন্ত্র। এই চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম চতুঃশতীতে আছে। (আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'নিত্যাষোড়শিকার্ণবে' এই নামগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভাস্কর রায়ের 'সেতুবন্ধ' টীকাতে প্রাকশিত হইয়াছে)। এই সকল তন্ত্রের বক্তা শম্ভু ও শ্রোত্রী পার্বতী। এইগুলি জগতের বিনাশকারক ও বৈদিক মার্গ হইতে দূরস্থ—ইহাই লক্ষ্মীধরের ব্যাখ্যা।

'অরুণামোদিনী' টীকা লক্ষ্মীধরের অনুগত। এই মতে ৬৫তম তন্ত্রখানা কি, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে উহা ভগবানের মন্ত্ররহস্য, যায়া শিবশক্তি উভয়ের বর্ণদ্বয়ের সম্মিশ্রণবশতঃ উভয়াত্মক।

চতুঃশতীতে উল্লিখিত ৬৪ তন্ত্রের নাম ও তদুপরি সৌন্দর্যলহরী টীকাতে প্রদত্ত লক্ষ্মীধরের ব্যাখ্যা এইরূপ—

১—২। **মহামায়াতন্ত্র ও শম্বরতন্ত্র**—ইহাতে মায়াপ্রপঞ্চনির্মাণের কথা আছে। মায়াপ্রপঞ্চনির্মাণের ফলে দ্রষ্টার ইন্দ্রিয় তদনুরূপ বিষয়কে গ্রহণ না করিয়া অন্যথা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যেমন বাস্তব জগতে যাহা ঘট, দ্রষ্টার নিকট তাহা প্রতিভাত হয়/ পটরূপে। ইহা কতকটা বর্তমান যুগের hypnotism প্রভৃতি মোহিনী বিদ্যার অনুরূপ।

৩। **যোগিনীজালশম্বর**—মায়াপ্রধান তন্ত্রকে শম্বর বলে। ইহাতে যোগিনীদের জাল দর্শন হয়। ইহার সাধনা শ্মশানাদি স্থানে উপদিষ্ট নিয়মে করিতে হয়।

৪। **তত্ত্বশম্বর**—ইহা একপ্রকার মহেন্দ্রজালবিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা একতত্ত্বে অন্য তত্ত্ব ভাসমান হয়। যেমন পৃথিবীতত্ত্বে জলতত্ত্বের ভান বা জলতত্ত্বে পৃথিবীতত্ত্বের ভান ইত্যাদি।

৫—১২। **সিদ্ধভৈরব, বটুকভৈরব, কংকালভৈরব, কালভৈরব, কালাগ্নিভৈরব, যোগিনীভৈরব, মহাভৈরব ও শক্তিভৈরব (ভৈরবাষ্টক)**—এই সকল গ্রন্থে নিধিবিদ্যার বর্ণনা আছে এবং ঐহিক কর্মসাধন কাপালিক মতের বিবরণ আছে। ইহার সবগুলিই অবৈদিক।

১৩—২০। **বহুরূপাষ্টক**—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, চামুণ্ডা, শিবদূতী,......(?) এইগুলি সবই শক্তি হইতে উদ্ভূত মাতৃকারূপ। এই আটটি মাতৃকা বিষয়ে আটটি তন্ত্র রচিত হইয়াছে। এইগুলি সবই লক্ষ্মীধরমতে অবৈদিক। ইহাতে আনুষঙ্গিকভাবে কোথাও কোথাও শ্রীবিদ্যার প্রসঙ্গ থাকিলেও এইগুলি বৈদিক সাধকের পক্ষে উপাদেয় নহে।

২১—২৮। **যমলাষ্টক**—যমলাশব্দের অর্থ কায়সিদ্ধা অম্বা। এই আটটি তন্ত্রের মধ্যেই যমলাসিদ্ধির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এইগুলিও অবৈদিক তন্ত্র।

২৯। **চন্দ্রজ্ঞান**—এই তন্ত্রে ষোলটি বিদ্যার প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তথাপি ইহা কাপালিক মত বলিয়া হেয়। চন্দ্রজ্ঞান নামে বৈদিক বিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থও আছে, কিন্তু উহা ৬৪ তন্ত্রের বহির্ভূত।

৩০। **মালিনীবিদ্যা**—ইহাতে সমুদ্রযানের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও অবৈদিক।

৩১। **মহাসম্মোহন**—জাগ্রৎ মনুষ্যকে সুপ্ত বা অচেতন করিবার বিদ্যা। ইহা বাল-জিহ্বাচ্ছেদাদি কু-উপায়ে সিদ্ধ হয়; সুতরাং ইহাও হেয়।

৩২—৩৬। **বামজুষ্টতন্ত্র, মহাদেবতন্ত্র, বাতুলতন্ত্র, বাতুলোত্তরতন্ত্র ও কামিক**—ইহা মিশ্রতন্ত্র। ইহাদের কোনো কোনো অংশ বৈদিক হইলেও বাকী সব অবৈদিক।

৩৭। **হৃদ্ভেদতন্ত্র**—ইহা কাপালিক মত। যদিও ইহাতে ষট্‌চক্রভেদ ও সহস্রারের কথা আছে তথাপি ইহাতে বামাচারের প্রাধান্য বলিয়া ইহা হেয়।

৩৮—৩৯। **তন্ত্রভেদ ও গুহ্যতন্ত্র**—একা ও গুপ্তভাবে পরকৃত তন্ত্রের ভেদের উপায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিদ্যার অনুষ্ঠানে বহু হিংসাদির প্রসঙ্গ হয়। সুতরাং উভয়ই অবৈদিক গ্রন্থ।

৪০। **কলাবাদ**—ইহাতে চন্দ্রকলাসমূহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন রচিত কামশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ ইহারই অন্তর্গত। কাম পুরুষার্থ হইলেও কলাগ্রহণ ও মোক্ষণ, দশস্থানের গ্রহণ এবং চন্দ্রকলারোপণ প্রভৃতির উপযোগ পুরুষার্থরূপ কামে নাই। এতদ্ব্যতীত বহু নিষিদ্ধাচারের উপদেশ এই তন্ত্রে আছে। ইহার নিষিদ্ধাংশ কাপালিক না হইলেও ঐ সকল আচারপরায়ণ লোক কাপালিকের ন্যায় হেয়।

৪১। **কলাসার**—ইহাতে বর্ণের উৎকর্ষসাধন কি-প্রকারে করিতে হয় তাহার বর্ণনা আছে। ইহা বামাচার-প্রধান তন্ত্র।

৪২। **কুণ্ডিকামত**—ইহাতে গুটিকাসিদ্ধির বর্ণনা আছে। ইহাও বামাচার-প্রধান গ্রন্থ।

৪৩। **মতোত্তরমত**—ইহাতে রসসিদ্ধির বিবেচনা দৃষ্ট হয়।

৪৪। **বীণাখ্য তন্ত্র**—বীণা একটি বিশিষ্ট যোগিনীর নাম। এই যোগিনীকে সিদ্ধ করিবার উপায় এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে বীণা যোগিনী নহে, সম্ভোগ-যক্ষিণীর নাম।

৪৫। **ত্রোতলতন্ত্র**—ইহাতে ঘুটিকা (পানপাত্র) অঞ্জন ও পাদুকাসিদ্ধির বিবরণ আছে।

৪৬। **ত্রোতলোত্তর**—ইহাতে ৬৪০০০ যক্ষিণীর দর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

৪৭। **পঞ্চামৃত**—পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের মরণাভাব পিণ্ডাণ্ডে কিপ্রকার সম্ভব হয়, তাহার বিবরণ ইহাতে আছে। ইহাও কাপালিক গ্রন্থ।

৪৮-৫২। **রূপভেদ, ভূতোড্ডামর, কুলসার, কুলোড্ডীশ** ও **কুলচূড়ামণি**—এই পাঁচটি তন্ত্রেই অন্যাকে মারিবার উপায় (মন্ত্রাদি প্রয়োগে) বর্ণিত হইয়াছে—এইগুলি অবৈদিক গ্রন্থ।

৫৩—৫৭। **সর্বজ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, অরুণেশ, মোদনীশ, বিকুণ্ঠেশ্বর**—এই পাঁচটি তন্ত্র দিগম্বর সম্প্রদায়ের উপজীব্য গ্রন্থ। এই সম্প্রদায় কাপালিক সম্প্রদায়ের অবান্তর ভেদ মাত্র।

৫৮—৬৪। **পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, নিরুত্তর, বিমল, বিমলোত্থ** ও **দেবীমত**—এইগুলি ক্ষপণক মতের গ্রন্থ। এই ক্ষপণক সম্প্রদায় দিগম্বর সম্প্রদায়ের অবান্তর ভেদ।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই ৬৪ তন্ত্রই শুধু ঐহিক ফলপ্রদ; পারমার্থিক কল্যাণের কোনো সন্ধান ইহাদের মধ্যে কোনটিতেই পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীধরের মতে এগুলি সবই অবৈদিক। লক্ষ্মীধর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পরম-কারুণিক পরমেশ্বর এই জাতীয় শাস্ত্রের অবতারণ করিলেন কেন, ইহা একটি সমস্যা। ইহার সমাধানকল্পে তিনি বলিয়াছেন যে পশুপতি শিব চতুর্বর্ণ ও মূর্ধাভিষিক্তাদি অনুলোম প্রতিলোম সকল জাতীয় লোকের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সকলের অধিকার সব তন্ত্রে নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অধিকার বিশুদ্ধ চন্দ্রকলাবিদ্যাতে আছে, কিন্তু ৬৪ তন্ত্রে শুধু শূদ্রদেরই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকারভেদে ব্যবস্থাভেদ হইয়া থাকে।

পূর্বে যে বিশুদ্ধ চন্দ্রকলাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে তাহা অবৈদিক চন্দ্রকলাবিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। আটটি বিশুদ্ধ চন্দ্রকলাবিদ্যা এই—**চন্দ্রকলা, জ্যোৎস্নাবতী, কুলার্ণব, কুলেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বার্হস্পত্য দুর্বাসামত**......(?)। এই সকল তন্ত্রে ত্রিবর্ণের অধিকার আছে, শূদ্রেরও আছে, তবে ত্রিবর্ণপক্ষে দক্ষিণমার্গে অনুষ্ঠান বিধেয়, কিন্তু শূদ্রদের পক্ষে বামাচারের বিধান রহিয়াছে। এই বিদ্যাতে কুলমার্গ ও সময়মার্গ উভয়ের মিলন রহিয়াছে।

৫

শুভাগমপঞ্চক (সময়মার্গ)

এই পাঁচটি আগমের নাম—**বশিষ্ঠ-সংহিতা, সনক-সংহিতা, শুক-সংহিতা, সনন্দন-সংহিতা** ও **সনৎকুমার-সংহিতা**। এই মার্গটি বৈদিক। বশিষ্ঠাদি পাঁচটি মুনি ইহার প্রদর্শক। ইহা সময়াচার অবলম্বন করিয়া প্রবর্তিত। লক্ষ্মীধর বলেন যে শংকরাচার্য স্বয়ং এই সময়াচারের অনুসরণ করিতেন। শুভাগমগুলি শুদ্ধ সময়-মার্গের প্রতিপাদক। শুভাগমে ষোড়শ-নিত্যার প্রতিপাদন মূল বিদ্যাতে অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়া করা হইয়াছে। তাই ইহা অঙ্গ-রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু চতুঃষষ্টি বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত যে চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যা তাহাতে ষোড়শ-নিত্যার প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জন্য ঐ মার্গ কৌলমার্গ।

পূর্বে যে স্বতন্ত্র তন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, যাহার উল্লেখ সৌন্দর্যলহরীতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে ভাস্কর রায় 'সেতুবন্ধে' বলেন যে উহা বোধ হয় বামকেশ্বর তন্ত্র। নিত্যা-ষোড়শিকার্ণব এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার গৌরীকান্ত বলেন যে ৬৪ তন্ত্রের অতিরিক্ত ৬৫তম তন্ত্র বোধহয় জ্ঞানার্ণবকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মত এই যে ঐ স্বতন্ত্র-বিশেষণ হইতে প্রতীত হয় যে উহা তন্ত্ররাজ নামক বিশিষ্ট তন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

৬

নবযুগের চতুঃষষ্টি-তন্ত্র

তোড়ল-তন্ত্রে ৬৪ তন্ত্রের নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই নামসূচী নবযুগের মত বলিয়া গ্রহণ করা চলে। সর্বানন্দ তাঁহার 'সর্বোল্লাস-তন্ত্রে' তোড়ল-তন্ত্রোক্ত ৬৪টি নাম প্রদান করিয়াছেন। এই নামসূচী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা চতুঃশতীর সূচীর অনুরূপ নহে এবং শ্রীকণ্ঠীর সূচীর অনুরূপও নহে। সর্বোল্লাসধৃত তোড়ল-তন্ত্রের সূচী এইপ্রকার—

১। কালী ২। মুণ্ডমালা ৩। তারা ৪। নির্বাণ ৫। শিবসার ৬। বীর ৭। নিদর্শন ৮। লতার্চন ৯। তোড়ল ১০। নীল ১১। রাধা ১২। বিদ্যাসার ১৩। ভৈরব ১৪। ভৈরবী ১৫। সিদ্ধেশ্বর ১৬। মাতৃভেদ ১৭। সময়া ১৮। গুপ্তসাধন ১৯। মায়া ২০। মহামায়া ২১। অক্ষয়া ২২। কুমারী ২৩। কুলার্ণব ২৪। কালিকা-কুলসর্বস্ব ২৫। কালিকা-কল্প ২৬। বারাহী ২৭। যোগিনী ২৮। যোগিনী-হৃদয় ২৯। সনৎকুমার ৩০। ত্রিপুরাসার ৩১। যোগিনী-বিজয় ৩২। মালিনী ৩৩। কুক্কুট ৩৪। শ্রীগণেশ ৩৫। ভূত ৩৬। উড্ডীশ ৩৭। কামধেনু ৩৮। উত্তম ৩৯। বীরভদ্র ৪০। বামকেশ্বর ৪১। কুলচূড়ামণি ৪২। ভাবচূড়ামণি ৪৩। জ্ঞানার্ণব ৪৪। বরদা ৪৫। তন্ত্রচিন্তামণি ৪৬। বাণীবিলাস ৪৭। হংসতন্ত্র ৪৮। চিদম্বর-তন্ত্র ৪৯। ফেৎকারিণী ৫০। নিত্যা ৫১। উত্তর ৫২। নারায়ণী ৫৩। উর্ধ্বাম্নায় ৫৪। জ্ঞানদীপ ৫৫। গৌতমীয় ৫৬। নিরুত্তর ৫৭। গর্জন ৫৮। কুব্জিকা ৫৯। তন্ত্র-মুক্তাবলী ৬০। বৃহৎ শ্রীক্রম ৬১। স্বতন্ত্র ৬২। যোনি ৬৩। কামাখ্যা।.........

দাশরথী-তন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬৪ তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সূচী পূর্ব সূচী হইতে ভিন্ন। India Office Libraryতে এই তন্ত্রের যে পুঁথি আছে তাহার লিপিকাল ১৬৭৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ। হরিবংশে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ ৬৪ খানি অদ্বৈত-তন্ত্র দুর্বাসার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (K. C. Pandey—Abhinava Gupta p. 55)। প্রসিদ্ধি আছে যে দুর্বাসাই কলিযুগে অদ্বৈত-তন্ত্রের প্রকাশক।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ **'জয়দ্রথযামল'** নামক তন্ত্র-গ্রন্থে তন্ত্রসাহিত্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ অনেক কথা আছে। উহার প্রথম ষট্‌ক ৪১ অধ্যায়ে বলা আছে যে যামল আটপ্রকার। এই আটপ্রকার যামলের মূল **ব্রহ্মযামল**। অন্যান্য যামলের মধ্যে **রুদ্রযামল যমযামল, স্কন্দযামল, বায়ুযামল** ও **ইন্দ্রযামলের** নাম পাওয়া যায় (জয়দ্রথ-যামলের ৩৬ অধ্যায়স্থ বিদ্যাপীঠের তন্ত্রসূচী)। ইহাদের নাম নিঃশ্বাস-তন্ত্রে নাই, কিন্তু ব্রহ্ম-যামলে আছে। যামল অষ্টকের ন্যায় **মঙ্গলাষ্টক, চক্রাষ্টক, শিখাষ্টক** প্রভৃতি তন্ত্রবর্গের নাম জয়দ্রথ-যামলে দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলাষ্টকের মধ্যে **ভৈরব, চন্দ্রগর্ভ, শনিমঙ্গল, সুমঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, বিজয়া, উগ্রমঙ্গলা** ও **সম্ভাবমঙ্গলার** নাম আছে। চক্রাষ্টকের মধ্যে **স্বরচক্র, বর্ণ-নাড়ী, গুহ্যাখ্য, কালচক্র, সৌরচক্র** প্রভৃতির নাম আছে। শিখাষ্টকের মধ্যে **শৌণ্ডী, মহোচ্ছুষ্মা, ভৈরবী, সংবরী, প্রপঞ্চকী, মাতৃভেদী রুদ্রকালী** প্রভৃতির নাম অন্তর্গত (বাগচি—পৃ. ১১২)।

জয়দ্রথ-যামলের ৩৬ অধ্যায়ে বিদ্যাপীঠের তন্ত্র-সকলের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উহা এইপ্রকার—**সর্ববীর** (সমাযোগ), **সিদ্ধ-যোগেশ্বরীমত, পঞ্চামৃত, বিশ্বাদ্য, যোগিনীজালসংবর, বিদ্যাভেদ, শিরশ্ছেদ, মহাসম্মোহন, মহারৌদ্র, রুদ্রযামল, বিষ্ণুযামল, ব্রহ্মযামল, রুদ্রভেদ, হরি (যামল), স্কন্দ (যামল), গৌতমী (যামল)** ইত্যাদি।

জয়দ্রথ-যামলের একখানি পুঁথি নেপাল দরবারে সংরক্ষিত আছে। উক্ত স্থানে **'পিঙ্গলা-মতের'** ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি আছে। এই পুস্তকখানি ব্রহ্ম-যামলের পরিশিষ্টরূপে বর্ণিত হয়। ইহাতে 'জয়দ্রথ-যামলে'র কথা আছে। 'পিঙ্গলামত' অনুসারে প্রাচীনকালে ব্রহ্ম-যামল অনুসরণকারী সাতটি তন্ত্রের মত প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে দুর্বাসার মত, সারস্বত মত প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

———

CALCUTTA SA. .KRIT COLLEGE RESEARCH SERI.. TEXT AND STUDIES

ALREADY PUBLISHED

Texts:—

		Rs.
1.	**Chandogya Brahmana**	15.00
2.	**Ravanavaha**	40.00
3.	**Kavyaprakasa (Part I, Ullasas I-IV.)**	12.00
4.	**Jnanalaksanavicara-rahasyam**	9.00
5.	**Muktivadavicara**	10.00
6.	**Savasutakasaucaprakarana**	5.00
7.	**Anumitermanasatva-vicarah**	8.00
8.	**Sangita-Damodara**	15.00
9.	**Dhvamsa-Janyabhavayoh Karya-Karanabha varahasyam**	5.00
10.	**Kavyaprakasa (Part-II, Ullasas V—X.)**	20.00
11.	**Atmabodhaprakarana**	5.00
12.	**Mahavastu Avadana**	25.00
1	**. .ada Smriti**	3.50

Studies:—

		Rs.
1.	**Studies in the Upapuranas (Vol-I.)**	25.00
2.	**Philosophy of Word and Meaning**	20.00
3.	**Studies in the Upanisads**	15.00
4.	**Studies in Nyaya-Vaisesika Theism**	15.00
5.	**Veda-Mimamsa (Vol-I)**	10.00
6.	**Harappa Culture and the West**	7.00
7.	**Sanskrita Colleger Itihas (Part-II)**	2.00
8.	**Vedartha-Vicarah**	15.00
9.	**Studies in the Upapuranas (Vol-II.)**	.0.00
10.	**Descriptive Catalogue of Manuscripts of Sanskrit College Library**	7.50
11.	**Epic Sources of Sanskrit Literature**	15.00
12.	**Medhatithi Bhasya (in four volumes)**	21 ..
13.	**Sanskrit Colleger Iti. .s (Part-I)**	2.00
14.	**Tantra o Agamasastrer Digdarsan (Vol. I.)**	5. .0

SHORTLY TO BE PUBLISHED

1. **Kundamala** edited by *Dr Kalikumar Dutta-Sastri*, M.A., D.Phil., Kavya-Sankhyatirtha.
2. **Kavyaprakasa of Mammata** with the 'Vistarika' of Paramananda Chakravartin (the earliest known commentator of Bengal) edited by *Dr Gaurinath Sastri* and *Professor Sivaprasad Bhattacharya*. M.A.
3. **Paip. ladasamhita** edited by *Professor Durgamohon Bhattacharjya* M.A
4. **Pratyal .lokaral .syam** edited by *Dr Gaurinath Sastri*, M . , P.R.S.
5. **Nyayaku. .anjr ite Isvarasiddhi** (in Bengali) by Pano . . .nath Nyaya-Tarka. . .
6. **Economics in Kautilya's Arthasastra** by *Dr B. .y Chandra Sen*, M.A., Ph.D.
7. **Udvahatattva of Raghunandana** with the commentaries of . .si. .ma, Śrīkṛṣṇa and Bhupendranath edited by *Dr Herambanath C. . ., Sastri*, M.A., D.Phil.,
8. **The Audumbaras** by *Sri Kalyan Kumar Dasgupta* M.A.
9. **Jottings . Sansk M .trics** by *Professor Sivaprasad Bhattacharya*. M.A.
10. **A Tri-lin. Dic. onary** (Sanskrit-Bengali-English) Edited by *Dr Govinda Gopal M. . . .vaya* and *Dr Gopikamohan Bhattacharya*